ভৌতিক অমনিবাস

অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট | কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

প্রকাশক : ময়ূথ বস্থ
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচবণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশির কুমাব সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকাব লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭

সূচীপত্র

রঙ্কিনী দেবীর খড়্গ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়ত খুঁজিতে জানিলে তাহাদের সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়ত আমাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না। শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মত সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহা আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলা হয়।

আমার জীবনে একবার এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল, যাহার যুক্তিযুক্ত কারণ তখন বা আজ কোন দিনই খুঁজিয়া পাই নাই—পাঠকদের কাছে তাই সেটি বর্ণনা করিয়াই আমি খালাস, তাঁহারা যদি সে রহস্যের কোন স্বাভাবিক সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন, যথেষ্ট আনন্দলাভ করিব।

ঘটনাটি এইবার বলি।

কয়েক বছর আগের কথা। মানভূম জেলার চেরো নামক গ্রামের মাইনর স্কুলে তখন মাষ্টারি করি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, চেরো গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনতর যে এখানে কিছুদিন বসবাস করিলে বাংলাদেশের একঘেয়ে সমতল ভূমির কোন পল্লী আর চোখে ভাল লাগে না। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালু সানুদেশ জুড়িয়া লম্বালম্বিভাবে সারা গ্রামের বাড়ি-

গুলি অবস্থিত। সর্বশেষ সারির বাড়ীগুলির খিড়কির দরজা খুললেই দেখা যায় পাহাড়ের উপরকার শাল, মহুয়া, কুচি, বিশ্ববৃক্ষের পাতলা জঙ্গল : একটি সুবৃহৎ বটগাছ ও তাহার তলায় বাঁধানো বেদী, ছোট বড় শিলাখণ্ড ও ভেলা-কাঁটার ঝোপ।

আমি যখন প্রথম ও-গ্রামে গেলাম তখন একদিন পাহাড়ের মাথায় বেড়াইতে উঠিয়া এক জায়গায় শালবনের মধ্যে একটি পাথরের ভাঙ্গা মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সঙ্গে ছিল আমার দুটি উপরের ক্লাসের ছাত্র তাহারা মানভূমের বাঙালী। একটা কথা —চেরো গ্রামের বেশিরভাগ অধিবাসী মাদ্রাজী, যদিও তাহারা বেশ বাংলা বলিতে পারে! অনেকে বাংলা আচার ব্যবহারও অবলম্বন করিয়াছে। কি করিয়া মানভূম জেলার মাঝখানে এতগুলি মাদ্রাজী অধিবাসী আসিয়া বসবাস করিল, তাহার ইতিহাস আমি বলিতে পারি না।

মন্দিরটি কালো পাথরের এবং একটু অদ্ভুত গঠনের। অনেকটা যেন চাঁচড়া রাজবাড়ির দশমহাবিদ্যার মন্দিরের মত ধরনটা—এ অঞ্চলে এরূপ গঠনের মন্দির আমার চোখে পড়ে নাই—তা ছাড়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও বিগ্রহ শূন্য। দক্ষিণের দেওয়ালের পাথরের চাঁই কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, দরজা নাই, শুধু আছে পাথরের চৌকাঠ। মন্দিরের মধ্যে ও চারিপাশে বনতুলসীর ঘন জঙ্গল—সান্ধ্য আকাশের পটভূমিতে সেই পাথরের বিগ্রহহীন ভাঙা মন্দির আমার মনে কেমন এক অনুভূতির সঞ্চার করিল। আশ্চর্যের বিষয়, অনুভূতিটা ভয়ের। ভাঙা মন্দির দেখিয়া মনে ভয় কেন হইল এ কথা তারপর বাড়ি ফিরিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছি। তবুও অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম মন্দিরটি ভাল করিয়া দেখিতে, একজন ছাত্র বাধা দিয়া বলিল—যাবেন না স্যর ওদিকে।

—কেন?

—জায়গাটা ভাল না, সাপের ভয় আছে সন্ধেবেলা। তাছাড়া লোকে বলে অনেক রকম ভয় ভীত আছে—মানে অমঙ্গলের ভয়। কেউ ওদিকে যায় না।

—ওটা কি মন্দির?

—ওটা রঙ্কিনী দেবীর মন্দির, স্যর। কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বুড়ো লোকেরাও কোনদিন ওখানে পূজো হতে দেখেনি—মূর্তিও নেই বহুকাল! ঐ রকম জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে আমাদের বাপ ঠাকুরদার আমলেরও আগে। চলুন স্যর নামি।

ছেলেটা যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি করতে লাগিল নামিবার জন্য। রঙ্কিনীদেবী বা তাহার মন্দির সম্বন্ধে দু একজন বৃদ্ধলোককে ইহার পর প্রশ্নও করিয়াছিলাম—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় যেন, আমার মনে হইয়াছে, রঙ্কিনীদেবী সংক্রান্ত কথাবার্তা বলিতে তাহারা ভয় পায়।

আমিও আর সে বিষয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়িয়া দিলাম। বছর-খানেক কাটিয়া গেল।

স্কুলে ছেলে কম, কাজ-কর্ম খুব হালকা, অবসর সময়ে এ গ্রামে ও গ্রামে বেড়াইয়া এ অঞ্চলের প্রাচীন পট, পুঁথি, ঘট ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এ বাতিক আমার অনেক দিন হইতেই আছে। নূতন জায়গায় আসিয়া বাতিকটা বাড়িয়া গেল।

চেরো গ্রাম হইতে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে জয়চণ্ডী পাহাড়। এখানে খাড়া উঁচু একটা অদ্ভুত গঠনের পাহাড়ের মাথায় জয়চণ্ডী ঠাকুরের মন্দির আছে। পৌষ মাসে বড় মেলা বসে। বি, এন, আর, লাইনের একটা ছোট ষ্টেশনও আছে এখানে।

এই পাহাড়ের কাছে একটা ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক ঘর মানভূম প্রবাসী উড়িয়া ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাণ্ডা নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হইয়া গেল—তিনি বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় আমার সঙ্গে অনেক রকমের

গল্প করিতেন। পট পুঁথি সংগ্রহের অবকাশে আমি জয়চণ্ডীতলা গ্রামে চন্দ্রমোহন পাণ্ডার নিকট বসিয়া তাঁহার মুখে এদেশের কথা শুনিতাম। চন্দ্র পাণ্ডা আবার স্থানীয় ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টারও। এদেশে প্রচলিত কতরকম আজগুবি ধরনের সাপের, ভূতের, ডাকাতের ও বাঘের (বিশেষ করিয়া বাঘের, কারণ বাঘের উপদ্রব এখানে খুব বেশি) গল্প যে বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শুনিয়াছি এবং এইসব গল্প শুনিবার লোভে কত আষাঢ়ের ঘন বর্ষার দিনে বৃদ্ধ পোষ্ট মাষ্টারের বাড়িতে গিয়া যে হানা দিয়াছি, তাহার হিসাব দিতে পারিব না।

মানভূমের এইসব আরণ্য অঞ্চল সভ্য জগতের কেন্দ্র হইতে দূবে অবস্থিত; এখানকার জীবনযাত্রাও একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যতই অদ্ভুত ধরনের গল্প হউক জয়চণ্ডী পাহাড়েব ছায়ায় শালবন বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার বাঁকা বাকা মানভূমেব বাংলায় সেগুলি শুনিবাব সময় মনে হইত—এদেশে একপ ঘটিবে ইহা আর বিচিত্র কি। কলিকাতা বালিগঞ্জের কথা তো ইহা নয়।

কথায় কথায় চন্দ্র পাণ্ডা একদিন বলিলেন—চেবো পাহাড়ের রঙ্কিনী দেবীর মন্দির দেখেছেন ?

আমি একটু আশ্চর্য হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম। রঙ্কিনীদেবী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আব কোন কথা কাহারও মুখে শুনি নাই, সেদিন সন্ধ্যায় আমার ছাত্রটির নিকট যাহা সামান্য কিছু শুনিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া।

বলিলাম—মন্দির দেখেছি, কিন্তু রঙ্কিনী দেবীর কথা জানবার জন্যে যাকেই জিজ্ঞেস করেছি, সেই চুপ করে গিয়েছে কিংবা অন্য কথা পেড়েছে।

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন—রঙ্কিনী দেবীর নামে সবাই ভয় পায়।

—কেন বলুন তো ?

—মানভূম জেলার আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করত।

তাদেরই দেবতা উনি। ইদানীং হিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদেরও ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কিনীদেবী হিন্দুদের দেবীর মত নয়। অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর। আগে ঐ মন্দিরে নরবলি হত—ষাট বছর আগেও রঙ্কিনী মন্দিরে নরবলি হয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করে রঙ্কিনীদেবী অসন্তুষ্ট হলে রক্ষা নেই অপমৃত্যু আর অমঙ্গল আসবে তাহলে। এরকম অনেকবার হয়েছে নাকি। একটা প্রবাদ আছে এ অঞ্চলে, দেশে মড়ক হবার আগে রঙ্কিনী দেবীর হাতের খাঁড়া রক্তমাখা দেখা যেত। আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগেকার কথা—তখন প্রাচীন লোকদের মুখে একথা শুনেছিলাম।

—রঙ্কিনী দেবীর বিগ্রহ, দেখেছিলেন মন্দিরে ?

—না, আমি এসে পর্যন্ত ওই ভাঙ্গা মন্দিরই দেখেছি। এখান থেকে কারা বিগ্রহটি নিয়ে যায়, অন্য কোন দেশে। রঙ্কিনী দেবীর এসব কথা আমি শুনতাম ওই মন্দিরের সেবাইত বংশের এক বৃদ্ধের মুখে। তাঁর বাড়ি ছিল এই চেরো গ্রামেই। আমি প্রথম যখন এদেশে আসি—তখন তাঁর বাড়ি অনেকবার গিয়েছি! দেবীর খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার কথাও তাঁর মুখে শুনি, এখন তাঁদের বংশে আর কেউ নেই। তারপর চেরো গ্রামেই আর বহুদিন যাইনি—বয়স হয়েছে, বড় বেশি কোথাও বেরোই নে।

—বিগ্রহের মূর্তি কি ?

—শুনেছিলাম কালীমূর্তি। আগে নাকি হাতে সত্যিকার নরমুণ্ড থাকত অসভ্যদের আমলে। কত নরবলি হয়েছে তার লেখা জোখা নেই—এখনো মন্দিরের পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঢিবি আছে—খুঁড়লে নরমুণ্ড পাওয়া যায়।

সাধে এ দেশের লোক ভয় পায়। শুনিয়া সন্ধ্যার পরে জয়-চণ্ডীতলা হইতে ফিরিবার পথে আমারই গা ছম-ছম করিতে লাগিল।

আরও বছর দুই সুখে দুঃখে কাটিল। জায়গাটা আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে হয়ত সেখানে আরও অনেক দিন থাকিয়া যাইতাম—কিন্তু স্কুল লইয়াই বাঙালীদের সঙ্গে মাদ্রাজীদের বিবাদ বাধিল। মাদ্রাজীরা স্কুলের জন্য বেশি টাকাকড়ি দিত, তাহারা দাবি করিতে লাগিল কমিটিতে তাহাদের লোক বেশি থাকিবে—ইংরেজীর মাষ্টার একজন মাদ্রাজী রাখিতেই হইবে, ইত্যাদি। আমি ইংরাজী পড়াইতাম—মাঝে হইতে আমার চাকুরী রাখা দায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের দেশে একটা হাইস্কুল হইয়াছিল, পূর্বে একবার তাহারা আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ম্যালেরিয়ার ভয়ে যাইতে চাহি নাই—এখন বেগতিক বুঝিয়া দেশে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কারণে চেরো গ্রামের মাষ্টারি আমায় ছাড়িতে হয় নাই। কিসের জন্য ছাড়িয়া দিলাম পরে সে কথা বলিব।

এমন সময় একদিন চন্দ্র পাণ্ডা চেবো গ্রামে কি কার্য উপলক্ষে আসিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, আমার বাসায় একটু চা খাইতে হইবে। তাঁহাব গরুর গাড়িসমেত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাসাবাড়িতে আনিলাম।

বৃদ্ধ ইতিপূর্বে কখনও আমার বাসায় আসেন নাই। বাড়িতে ঢুকিয়াই চারিদিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুবে বলিলেন—এই বাড়িতে থাকেন আপনি ?

বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট্ট গাঁ, বাড়ি তো পাওয়া যায় না—আগে স্কুলের একটা ঘরে থাকতাম। বছরখানেক হল স্কুলের সেক্রেটারী রঘুনাথন্ এটা ঠিক করে দিয়েছেন।

পুরানো আমলের পাথরের গাঁথুনির বাড়ি। বেশ বড় বড় তিনটি কামরা, একদিকে একটা যাতায়াতের বারান্দা। জবরদস্ত গড়ন, যেন খিলজিদের আমলের দুর্গ কি জেলখানা—হাজার ভূমিকম্পেও এ বাড়ির একটু চুনবালি খসাইতে পারিবে না। বৃদ্ধ বসিয়া আবার

বাড়িটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলাম বাড়িটার গড়ন তাঁহার ভাল লাগিয়াছে। বলিলাম—সেকালের গড়ন, খুব টন্‌কো—আগা গোড়া পাথরের —

চন্দ্রপাণ্ডা বলিলেন—না সে জন্য নয়। আমি এই বাড়িতে প্রায় ত্রিশ বছর আগে যথেষ্ট যাতায়াত করতাম। এই বাড়িই হল রঙ্কিনীদেবীর সেবাইত বংশের। ওদের বংশে এখন আর কেউ নেই। আপনি যে এ বাড়িতে আছেন তা জানতাম না। তা বেশ, বেশ। অনেকদিন পরে বাড়িতে ঢুকলাম কিনা, বড় অদ্ভুত লাগছে। তখন বয়েস ছিল ত্রিশ, এখন প্রায় ষাট।

তারপর অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। চা পান করিয়া বৃদ্ধ গরুর গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

আরও বছর খানেক কাটিয়াছে। দেশের স্কুলে চাকুরির আশ্বাস পাইলেও আমি এখনও যাই নাই। কারণ এখানকার বাঙ্গালী মাদ্রাজী সমস্যা একরূপ মিটিয়া আসিয়াছে। আপাতত আমার চাকুরিটা বজায় রহিল বলিয়াই তো মনে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ।

পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে আমারই এক ছাত্রের বাড়িতে অন্নপূর্ণাপূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। মধ্যে রবিবার পড়াতে শনিবার গরুর গাড়ি করিয়া রওনা হই, রবিবার ও সোমবার থাকিয়া মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলা আবশ্যক, বাসায় আমি একাই থাকি। স্কুলের চাকর রাখোহরিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়াই বলিয়া উঠিল—এঃ, এ কিসের রক্ত। দেখুন—

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম।

তাই বটে! বাহিরের দরজায় চৌকাঠের ঠিক ভিতর দিক হইতেই রক্তের ধাপ উঠান বহিয়া যেন চলিয়াছে। একটানা ধারা নয়, ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের একটা অবিচ্ছিন্ন সারি। একেবারে

টাটকা রক্ত—এইমাত্র সদ্য কাহারও মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

আমি তো অবাক! কিসের রক্তের ধারা এ! কোথা হইতেই বা আসিল? দু তিন দিন তো বাসা বন্ধ ছিল—বাড়ির ভিতরে উঠানে রক্তের দাগ আসে কোথা হইতে—তাহার উপর সদ্য তাজা রক্ত!

অবশ্য কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুরের কথা মনে পড়িল। এ ক্ষেত্রে পড়াই স্বাভাবিক। চাকরকে বলিলাম—দেখ তো রে, রক্তটা কোন দিকে যাচ্ছে—এ সেই হুলো বিড়ালটির কাজ···

রক্তের ধারা গিয়াছে দেখা গেল সিঁড়ির নীচের চোরকুঠুরির দিকে। ছোট্ট ঘর, ভীষণ অন্ধকার এবং যত রাজ্যের ভাঙাচোরা পুরানো মালে ভর্তি বলিয়া আমি কোন দিন চোরকুঠুরি খুলি নাই। চোরকুঠুরির দরজা পার হইয়া বন্ধ ঘরের মধ্যে রক্তের ধারাটার গতি দেখিয়া ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকাল ধরিয়া ঘরটা বাহির হইতে তালাবন্ধ, যদি বিড়ালের ব্যাপারই হয়, বিড়াল ঢুকিতেও তো ছিদ্র-পথ দরকার হয়।

চোরকুঠুরির তালা লোহার শিকের চাড় দিয়া খোলা হইল। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল ঘরটায় পুরানো, ভাঙা তোবড়ানো টিনের বাক্স, পুরানো ছেঁড়া গদি, খাটের পায়া, মরিচা ধরা সড়কি, ভাঙা টিন, শাবল প্রভৃতি ঠাসা বোঝাই। ঘরের মেঝেতে সোজা রক্তের দাগ এক কোণের দিকে গিয়াছে—রাখোহরি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিল—একি বাবু! এ দিকে কি করে এমনধারা রক্ত লাগল।

তারপর সে কি একটা জিনিষ হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দেখুন কাণ্ডটা বাবু· জিনিষটাকে হাতে লইয়া সে বাহিরে আসিতে তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।

একখানা মরিচা-ধরা হাতল-বিহীন ভাঙা খাঁড়া বা রামদা—আগার দিকটা চওড়া ও বাঁকানো—বড় চওড়া ফলাটা তাহার রক্তে

টকটকে রাঙা। একটু রক্ত নয়, ফলাতে আগাগোড়া রক্ত মাখানো। মনো হয় যেন খাঁড়াখানা হইতে টপ-টপ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে।

সেই মুহূর্তে এক সঙ্গে আমার অনেক কথা মনে হইল। তুই বৎসর পূর্বে চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শোনা সেই গল্প। বঙ্কিনী দেবীর সেবাইত বংশের ভদ্রাসন বাড়ি এটা। পুরানো জিনিষের গুদাম এই চোরকুঠুরিতে বঙ্কিনী দেবীর হাতের খাঁড়াখানা তাহারাই রাখিয়া ছিল হয়তো।··· মড়কের আগে বিগ্রহের খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ায় প্রবাদ।

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

মড়ক কোথায় ভাবিতে পারিতাম, যদি সময় পাইতাম সন্দেহ করিবার। কিন্তু তাহা পাই নাই। পরদিন সন্ধ্যার সময় চেরো গ্রামে প্রথম কলেরা রোগের খবর পাওয়া গেল। তিন দিনের মধ্যে রোগ ছড়াইয়া মড়ক দেখা দিল—প্রথমে চেরো, তারপর পাশের গ্রামে কাজরা। ক্রমে জয়চণ্ডীতলা পর্যন্ত মড়ক বিস্তৃত হইল। লোক মরিয়া ধুলধাবাড় হইতে লাগিল। চেরো গ্রামের মাদ্রাজী বংশ প্রায় কাবার হইবার জোগাড় হইল।

মড়কের জন্য স্কুল বন্ধ হইয়া গেল। আমি দেশে পলাইয়া আসিলাম, তারপর আর কখনও চেরোতে যাই নাই—গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বেই দেশের স্কুলের চাকুরিটা পাইয়াছিলাম।

সেই হইতে রঙ্কিনী দেবীকে মনে মনে ভক্তি করি। তিনি অমঙ্গলের পূর্বাভাস দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র। মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকেই অমঙ্গলের কারণ ভাবিয়া ভুল বোঝে।

একটি ভৌতিক ঘটনা

তুষারকান্তি ঘোষ

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন আমার বাবা শিশিরকুমার ঘোষ বেঁচে ছিলেন; আমাদের পরিবারের তখন পরলোক সম্বন্ধে নিয়মিত চর্চা ও গবেষণা হত। আমার বাবা সে-সময় 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন' বলে প্রেততত্ত্ব বিষয়ক একখানা মাসিক পত্রিকাও বার করতেন। তখন সকালবেলা প্রায়ই আমাদের সার্কল-এ বসা হত। অর্থাৎ আমাদের পরিবারের জনকয়েক স্ত্রী-পুরুষ একটা গোল-টেবিলে হাত রেখে কোন এক পরলোকগত আত্মার চিন্তা করতেন এবং যাতে খারাপ ও অসৎ আত্মা আসতে না পারে সেজন্য আমাদের একজন কীর্তন গান করতেন। সেই সময় প্রায়ই আমাদের কোন না কোন মৃত আত্মীয় আসতেন এবং যিনি যেদিন মিডিয়াম হতেন তাঁর মাধ্যমে আমার বাবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। সামনে কাগজ-পেনসিল থাকত—কোন প্রশ্ন করলে সেই কাগজে লিখে জবাব দেওয়া হত। তখন আমাদের বাড়িতে তিনজন মিডিয়াম ছিলেন—তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল মিডিয়াম ছিলেন আমার এক সহোদরা দিদি, তাঁর ডাকনাম ছিল ফুলি।

একদিন আমার স্বর্গীয়া মা সার্কল-এ এসেছেন। বাবা তাঁকে প্রশ্ন করছেন যে তিনি কোথায় আছেন, কাদের সঙ্গে আছেন এবং কেমন আছেন। আমার দিদির মাধ্যমে সেইসব প্রশ্নের জবাব লিখে দিচ্ছেন। একটু বাদে আমার মা বললেন, আমি যাচ্ছি; আমার যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফুলিকে জাগিয়ে দাও। মিডিয়াম এই অবস্থাতে ঘোরাচ্ছন্ন থাকতেন এবং তাঁর হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দেওয়া হত। সে দিন মা বললেন, এখানে একটি

খারাপ মেয়েমানুষের আত্মা উপস্থিত আছে; ফুলিকে যদি এই আচ্ছন্ন অবস্থায় পায়, তাহলে আমি চলে গেলেই সে ফুলিকে পেয়ে বসবে। আমি এই পেনসিলটি যেই ছেড়ে দেব, তোমরা তৎক্ষণাৎ ফুলিকে জাগিয়ে দিও।

মা পেনসিলটি টেবিলের উপর ফেলে দেওয়া মাত্রই দিদিকে জাগানোর চেষ্টা করা হল কিন্তু ফল পাওয়া গেল না। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে দিদির চোখ লাল এবং হাতের মুঠি শক্ত হয়ে গেল। টেবিলে দু-তিনবার ঘুষি মেরে তিনি কি সব বলতে লাগলেন। আমরা শুনলুম যে তিনি নিকৃষ্ট উর্দু ভাষায় কথা বলছেন এবং যেন বিড়বিড় করে গালাগালি দিচ্ছেন। বাবা এবং আমাদের আরও দু-একজন তাঁকে চলে যেতে বললেন। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনলেন না। ক্রমে দুর্দান্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাষা আরও খারাপ ও কঠোর হয়ে উঠল। আমার দিদি উর্দু ভাষার একটি কথাও জানেন না। অথচ তাঁর মুখ দিয়ে তখন অনর্গল এই ভাষা বার হচ্ছিল। একটু বাদেই দিদি উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের নির্জন ছাতে গেলেন। সেখানে একটা নদমার সামনে বসে পা দোলাতে দোলাতে তেরি-মেরি করে একটা গান গাইতে লাগলেন। ততক্ষণে আমাদের বাড়ীর অনেকে ছাতে এসে গেছেন। বাবা প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতেন বলে তাঁর ওপরে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি দিদিকে রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু আমার বাবা হঠাৎ বললেন, 'হা ভগবান, এ কি করলে?' তখন আমরা দিদির প্রাণের আশা ছেড়ে দিলুম। আমার এক বলশালী দাদা ছিলেন। তিনি বললেন, 'দাড়াও, আমি ভূতকে মজা দেখাচ্ছি।' তিনি দেশলাই জ্বেলে আমার দিদির পিঠে ছেকা দিতে লাগলেন। বড় বড় চার-পাঁচটা ফোসকা উঠল, কিন্তু দিদির গ্রাহ্য নেই। বরঞ্চ মাথা নেড়ে আর পা দুলিয়ে দুলিয়ে সেই উর্দু গানটা গেয়ে যেতে লাগলেন। এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারছি, দিদিকে আর বাঁচান যাবে না!

ঠিক সেই সময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। নর্দমার পাশে দেওয়ালের একটা কোণ ছিল। সেটা একেবারে নির্জন। হঠাৎ দিদি দাড়িয়ে উঠে সেই কোণের দিকে চেয়ে জোড় হাত করে 'তো গোড় পড়ি, তো গোড় পড়ি'—বলে করুণভাবে চীৎকার করতে লাগলেন এবং হঠাৎ দুই হাত মাথার ওপরে তুলে সজোরে বুক চেপে মাটিতে পড়ে গেলেন। যার জ্ঞান আছে তেমন কোন লোক সটাং ও-ভাবে মাটিতে পড়তে পারে না। কারণ ঐ রকম পড়লে শরীরে ভীষণ আঘাত লাগে।

দিদি পড়ে যাওয়াতে এক বালতি জল তাঁর মাথায় ঢেলে দেওয়া হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গে দিদির ভীষণ চীৎকার—'জ্বলে গেলুম—জ্বলে গেলুম।' কারণ পিঠের সেই ফোসকায় জল লেগেছিল। দিদিকে তুলে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তাঁর পিঠের যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে ওষুধ দেওয়া হল।

এই ঘটনার তাৎপর্য কি জানবার জন্যে এর ক'দিন বাদে আবার সার্কল-এ বসা হ'ল। আমার মা এসে জানালেন যে তিনি ও তাঁর দিদি ঐ দুষ্টু প্রেতাত্মাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাবা বললেন, 'কেমন করে তাড়ালে?' মা বললেন 'ভাল আত্মার সামনে দুষ্টু আত্মা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। আমরা কটমট করে তার দিকে চেয়ে বললুম যে এক্ষুণি ছেড়ে যাবি তো যা—নইলে তোর অশেষ দুর্গতি করব। তখন সে বললে, তোমাদের পায়ে পড়ি আমায় কিছু কোর না, আমি এখুনি ছেড়ে যাচ্ছি!' তারপরে মা জানালেন যে মেয়েটি চা-বাগানের কুলি ছিল; তার ওপরে অত্যাচার করা হয় এবং সেই জন্যে সে আত্মহত্যা করেছিল। সে বড় দুঃখী। সেই জন্যে সে একটা ভাল দেহ পেলে তাতে আশ্রয় নিতে চায়।

এ ঘটনা যখন ঘটেছিল, তখন আমার মাত্র নয় দশ বছর বয়স। তবুও ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মনে আছে। এর একটা কারণ এই যে পরে বহুদিন বহুবার ঘটনাটা আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি।

লালচুল

মনোজ বসু

ছ' মাস ধরিয়া বিয়ের দিনই সাব্যস্ত হয় না। তারপর দিন ঠিক হইল তো গোল বাধিল জায়গা লইয়া। মোটে তখন দিন পনের বাকি, হঠাৎ নীলমাধবের চিঠি আসিল, কাজিডাঙা অবধি যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না, তাঁহারা বড় জোর খুলনায় আসিয়া শুভকর্ম করিয়া যাইতে পারেন।

বিয়ের ঘটক শীতলচন্দ্র বিশ্বাস। চিঠি লইয়া সে-ই আসিয়াছিল। ভিড় সরিয়া গেলে আসল কারণটা সে শেষকালে ব্যক্ত করিল। প্রতিপক্ষ চৌধুরিদের সীমানা কাজিডাঙার ক্রোশ তিনেকের মধ্যে। বলা তো যায় না, তিন ক্রোশ দূর হইতে কয়েক শত লাঠিও যদি বিয়ের নিমন্ত্রণে চলিয়া আসে! তাহারা বরাসন হইতে বর তুলিয়া রাত্রির অন্ধকারে গাঙ পাড়ি দিয়া বসিলে অজ পাড়াগাঁয়ে জল-জঙ্গলের মধ্যে কেবল নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া করিবার কিছু থাকিবে না।

পাত্র জমিদারের ছেলে। জমিদারের ছেলে ঐ একটিমাত্র। অতএব এই ছ'মাস ধরিয়া যে জমিদার-বাড়িতে শুভকর্মের গুরুতর আয়োজন চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আয়োজনের সত্যকার চেহারাটা সহসা উপলব্ধি করিয়া আনন্দে মেয়ের বাপের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

অথচ মিনুর মা আড় হইয়া পড়িলেন। ঐ ঃওশে মেয়ের বিয়ে

আমি দেবোই—বার বার এই রকম গোছগাছ করে শেষকালে যে···না-হয় তুমি সেই বি. এ. ফেল ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল।

কিন্তু অত বড় ঘর ও বরের লোভ ছাড়িয়ে দেওয়া সোজা কথা নয়। শেষ পর্যন্ত আবশ্যকও হইল না। শহরের প্রান্ত-সীমানায় নদীর ধারে সেরেস্তাদার বাবু এক নূতন বাড়ি তুলিতেছিলেন। বাড়িটা তিনি কয়েক দিনের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন। সামনের ফাঁকা জমির ইট-কাঠ সরাইয়া সেখানে সামিয়ানা খাটাইয়া বরযাত্রী বসিবার জায়গা হইল। পিছনে খাওয়ার জায়গা। যদি দৈবাৎ বৃষ্টি চাপিয়া পড়ে, তাহা হইলে দোতলার দরদালানে সত্তর-আশি জন করিয়া বসাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বিকালে পাঁচখানা গরুর-গাড়ি বোঝাই আরও অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব আসিয়া পড়িল। লগ্ন সাড়ে-আটটায়।

রানী বলিল, মাসীমা, হিরণের বিয়ের বেলা আপনি বড্ড অন্যায় করেছিলেন। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি যে জামাই নিয়ে খাওয়াতে বসবেন—সে হবে না কিন্তু।

মিনুর মা হাসিলেন।

না, সে হবে না মাসিমা। সমস্ত রাত আমরা বাসর জাগব, কোন কথা শুনব না বলে দিচ্ছি। নয় তো বলুন, এক্ষুনি ফের গাড়িতে উঠে বসি।

রসুই-ঘরের দিকে হঠাৎ গণ্ডগোল। বেড়ার উপরে কে জলন্ত কাঠ ঠেস দিয়া রাখিয়াছিল, একটা অগ্নিকাণ্ড হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সকলের বিশ্বাস, কাজটা বামুনঠাকুরের। তাই রাগ করিয়া কে তার গাঁজার কলিকা ভাঙিয়া দিয়াছে। পৈতা হাতে বারম্বার ব্রাহ্মণ-সন্তান দিব্যি করিতেছিল, বিনা অপরাধে তাহার গুরু দণ্ড হইয়া গেল, অগ্নিকাণ্ডে কলিকার দোষ নাই। তিন দিনের মধ্যে কলিকা মোটে সে হাতে লয় নাই।

বেলা ডুবিয়া যাইতে শীতল ঘটক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল।

খবর কি ? খবর কি ?

শীতল কহিল, খবর ভাল, বর বরযাত্রীরা ওঁদের বাসাবাড়ি পৌঁছে গেছেন। জজবাবুর বড় মোটর এনে সাজানো হচ্ছে। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে এসে পড়বেন।

তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিতে লাগিল, একশ' বরকন্দাজ ঘাট আগলাচ্ছে। কি-জানি কিছু বলা যায় না। আমাদের কর্তাবাবু একবিন্দু খুঁত রেখে কাজ করবেন না।

মোটরের আওয়াজ উঠিতেই ধুপধাপ করিয়া আট-দশটা মেয়ে ছুটিল তেতলার ছাতে। সকলের পিছন হইতে নিরু বলিল, যাওয়া ভাই অনর্থক। ছাত থেকে কিছু দেখা যাবে না। তার চেয়ে গোলকুঠ্‌রির জানালা দিয়ে—

কৌতূহল চোখ মুখ দিয়া যেন ছিটকাইয়া পড়িতেছে। ঠাট্টা-তামাসা—ছুটাছুটি—মাঝে মাঝে হাসির তরঙ্গ। তার মধ্যে যুক্তি বিবেচনার কথা কে শুনবে ?

রানী সকলের আগেভাগে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আঙুল দিয়া দেখাইল : ঐ, ঐ যে বর—দেখ—

মরবি যে এক্ষুনি পড়ে—ছাতের এখনো আলসে হয়নি দেখছিস। বলিয়া আর একটি মেয়ে রানীকে পিছে ঠেলিয়া নিজে আগে আসিল। যেন সে মোটেই পড়িয়া মরিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিল : কই ? ও রানী, বর দেখলি কোন দিকে ?

গলায় ফুলের মালা—ঐ যে। দেখতে পাও না—তুমি যেন কী রকম সেজদি।

সেজদি বলিল, মালা না তোর মুণ্ডু। ও যে এক বুড়ো—সাদা চাদর কাঁধে। থুথ্‌ড়ে, মাগো, তিন কালের বুড়ো—ও বরের ঠাকুরদাদা। বর এতক্ষণ কোন কালে আসনে গিয়ে বসেছে।

ছাতের উপর হইতে বরাসনে নজর চলে না, দেখা যায় কেবল সামিয়ানা।

নিরু বলিল, বলেছি তো অনর্থক। তার চেয়ে নিচে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে দেখিগে চল্।

চল্ চল্—

অন্ধকারে নদী মৃদুতম গানের সুর তুলিয়া যাইতেছে। ওপারেও যেন কিসের উৎসব—অনেকগুলো আলো, ঢাকের বাজনা···সহসা এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস উহাদের রঙিন শাড়ি, কেশ-বেশের সুগন্ধ, উচ্ছল কলহাস্যের টুকরাগুলি উড়াইয়া ছড়াইয়া বহিয়া গেল।

ঘুমিয়ে কে রে? মিনু? ওমা—মাগো, যার বিয়ে তার মনে নেই। পালিয়ে এসে চিলেকোঠায় ঘুমানো হচ্ছে!

রানী হাত ধরিয়া নাড়া দিতে মিনু একবার চাহিয়া চোখ বুজিল।

নিরু বলিল, আহা সারাদিন না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। ঘুমোক না একটু—আমরা নিচে যাই।

সেজদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল: গিন্নিপনা রাখ্ দিকি। আমরাও না খেয়ে ছিলাম একদিন। ঘুমোনোর দফা শেষ আজকের দিন থেকে। কি বলিস রে রানী?

বিশেষ করিয়া রানীকেই জিজ্ঞাসা করিবার একটা অর্থ আছে। কথাটা গোপনীয়, কেবল সেজদি আড়ি দিতে গিয়া দৈবাৎ জানিয়া ফেলিয়াছিল। রানী মুখ টিপিয়া হাসিল। দুই হাতে ঘুমন্ত মিনুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমু খাইতে লাগিল।

মিনু ভাই, জাগো—আজকে রাতে ঘুমুতে আছে? উঠে বর দেখবে এসো।

তারপর মিনুর এলোচুলে হাত পড়িতে শিহরিয়া উঠিল।

দেখেছ? সন্ধ্যেবেলা আবার নেয়ে মরেছে হতভাগী। শুয়ে শুয়ে চুল শুকনো হচ্ছে। ভিজে চুল নিয়ে এখন উপায়? এই রাশ বাঁধতে কি সময় লাগবে কম?

নিচে উলুধ্বনি উঠিল। পিসিমা নন্দরানী শুভা ওদের সব গলা। চল্ চল্—

চুল বাঁধতে ওঠ্‌ মিনু, শিগগির উঠে আয়—

বলিয়া মিনুর এলোচুল ধরিয়া জোরে এক টান দিয়া রানী ছুটিয়া দলে মিশিল। সিঁড়িতে আবার সমবেত পদধ্বনি।

ধড়মড় করিয়া মিনু উঠিয়া বসিল। তখন রানীরা নামিয়া গিয়াছে। ছাতে কেহ নাই।

ঘুমচোখে প্রথমটা ভাবিল এটা যেন তাদের কাজিডাঙার বাড়ির দক্ষিণের চাতাল। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে। ছাতে ঝাপসা ঝাপসা আলো। ওদিকে ভয়ানক গণ্ডগোল উঠিতেছে।···সব কথা মিনুর মনে পড়িল : আজ তার বিয়ে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সকলে ডাকাডাকি লাগাইয়াছে। হঠাৎ নিচের দিকে কোথায় দপ করিয়া সুতীব্র আলো জ্বলিয়া অনেকখানি রশ্মি আসিয়া পড়িল ছাদের উপর। তাড়াতাড়ি আগাইয়া সিঁড়ি ভাবিয়া যেই সে পা নামাইয়া দিয়াছে—

চারিদিকে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। আসর ভাঙিয়া সকলে ছুটিল। হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান চলিতেছিল, পায়ের আঘাতে আঘাতে সেটা যে কোথায় চলিয়া গেল তার ঠিকানা রহিল না। একেবারে একতলার বারান্দায় পড়িয়া মিনু নিশ্চেতন।

জল, জল···মোটর আনো···ভিড় করবেন না মশাই, সরুন—ফাঁক করে দিন···আহা-হা কি কর, মোটরে তোল শিগগির···

গামছা কাঁধে কোন দিক হইতে কন্যার বাপ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।

জজবাবুর সেই মোটরে চড়িয়া মিনু হাসপাতালে চলিল। বড় রাস্তায় রশি দুই পথ গিয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, আর যাইতে হইল না।

রসুনচৌকি থামিয়া গিয়াছে। দরজায় পূর্বদিকে ছোট লাল চাদরের নিচে চারিটা কলাগাছ পুঁতিয়া বিয়ের জায়গা হইয়াছিল। সেইখানে শব নামাইয়া রাখা হইল।

কাঁচা হলুদের মতো রং, তার উপর নূতন গহনা পরিয়া যেন রাজ

রাজেশ্বরী হইয়া শুইয়া আছে। কনেচন্দন-আঁকা শুভ্র কপাল ফাটিয়া চাপ চাপ জমা রক্ত লেপিয়া রহিয়াছে, নাক ও গালের পাশ বহিয়া রক্ত গড়াইয়াছে—মেঘের মতো খোলা চুলের রাশি এখানে সেখানে রক্তের ছোপে ডগমগে লাল।

ভিতরে বাহিরে নিদারুণ স্তব্ধতা। বাড়িতে যেন একটা লোক নাই। শবের মাথার উপরে একটি খরজ্যোতি গ্যাস জ্বলিতেছে। বাড়ির মধ্য হইতে স্তব্ধতা চিরিয়া হঠাৎ একবার আর্তনাদ আসিল : ও মা, ও মাগো আমার, ও আমার লক্ষ্মীমাণিক রাজরাণী মা—

নীলমাধব সকলের দিকে চাহিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন : হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ যে ?

বরশয্যার প্রকাণ্ড মেহগ্নি-পালিশ খাট ক'জনে টানিয়া নামাইয়া আনিল।

এতক্ষণ বেণুধরকে লক্ষ্য হয় নাই। এইবার ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া শবের পায়ের কাছে খাটের বাজুতে ভর দিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। হাতের মুঠায় কাজললতা তেমনি ধরা আছে। কাচের মতো স্বচ্ছ অচঞ্চল আধ-নিমীলিত দু'টি দৃষ্টি। মৃতার সেই স্তিমিত চোখ দু'টির দিকে নিষ্পলক চাহিয়া বেণুধর দাঁড়াইয়া রহিল।

বাপ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাগলের মতো আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন : একবার ভাল করে চা দিকি। চোখ তুলে চা ও খুকী—

নীলমাধব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন! কিন্তু থামিলেন না, সজল চোখে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, ও বেয়াই, বিনি দোষে মাকে আমার কত গালমন্দ করেছি—কোনো সম্বন্ধ এগুতে চায় না, তার সমস্ত অপরাধ দিনরাত মা ঘাড় পেতে নিয়েছে, একবার মুখ তুলে একটা কথা বলেনি। ও খুকী, আর বকব না, চোখ তুলে চা একটিবার।

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নীলমাধব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করিয়া

উঠিলেন : কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দেখবে তোমরা ? আটটা বেজে গেছে, রওনা হও।

সাড়ে-আটটায় লগ্ন ছিল। বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। যেন শুভলগ্নে তাহাদের শুভদৃষ্টি হইতেছে, লজ্জানত বালিকা চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছে না, বাপ তাই মেয়েকে সাহস দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া গেট হইয়াছিল, সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া সকলে শবের উপর ঢালিয়া দিল। বেণুধর গলার মালা ছিঁড়িয়া সেই ফুলের গাদায় ছুঁড়িয়া দ্রুতবেগে ভিড়ের মধ্য দিয়া পলাইয়া গেল।

ছুটিতে ছুটিতে রাস্তা অবধি আসিল। সর্বাঙ্গ দিয়া ঘামের ধারা বহিতেছে, পা টলিতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে! মোটরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উন্মত্তের মতো সে বলিয়া উঠিল, চালাও, এক্ষুনি—

গাড়ি চলিতে লাগিলে হুঁশ হইল, তখনো আগাগোড়া তাহার বরের সাজ। একবোঝা কোট্‌-কামিজ, তার উপর শৌখিন ফুলকাটা চাদর—বিয়ে উপলক্ষে পছন্দ করিয়া সমস্ত কেনা। একটা একটা করিয়া খুলিয়া পাশে স্তূপাকার করিতে লাগিল।

তবু কী অসহ্য গরম! বেণুর মনে হইল, সর্বদেহ ফুলিয়া ফাটিয়া এবারে বুঝি ঘামের বদলে রক্ত বাহির হইবে। ক্রমাগত বলিতে লাগিল, চালাও—খুব জোরে চালাও গাড়ি—

সোফার জিজ্ঞাসা করিল : কোথায় ?

যেখানে খুশি। ফাঁকায়—গ্রামের দিকে—

তীরবেগে গাড়ি ছুটিল। চোখ বুজিয়া চেতনাহীনের মতো বেণুধর পড়িয়া রহিল।

সুমুখ-আঁধার রাত্রি, তার উপর মেঘ করিয়া আরও আঁধার জমিয়াছে। জনবিরল পথের উপর মিটমিটে কেরোসিনের আলো

যেন প্রেতপুরীর পাহারাদার। একবার চোখ চাহিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বেণু শিহরিয়া উঠিল। এমন নিবিড় অন্ধকার সে জীবনে দেখে নাই। দু'ধারের বাড়িগুলির দরজা-জানালা বন্ধ, ছোট শহর ইহারই মধ্যে নিশুতি হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আম-কাঁঠালের বড় বাগিচা।···

সহসা কোথায় কোন দিক দিয়া উচ্ছল হাসির শব্দ বাজিয়া উঠিল, অতি অস্পষ্ট কৌতুক-চঞ্চল অনেকগুলা কণ্ঠস্বর—

বউ দেখিয়ে যাও, বউ দেখিয়ে যাও, বউ দেখিয়ে যাও গো!

আশপাশের সারি সারি ঘুমন্ত বাড়িগুলির ছাতের উপর, আম-বাগিচার এখানে ওখানে, ল্যাম্পপোস্টের আবছায়ায় নানা বয়সের কত মেয়ে কৌতূহলভরা চোখে ভিড় করিয়া বউ দেখিতে দাঁড়াইয়া আছে।

তারপর গাড়ির মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া এক পলকে যেন তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

বধূ তাহার পাশে রহিয়াছে। সত্যই একটি বউ মানুষ ঘোমটার মধ্যে জড়সড় হইয়া মাথা নোয়াইয়া একেবারে গদির সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে, গায়ে ছোঁয়া লাগিলে যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। তারপর খেয়াল হইল, এসব তার পরিত্যক্ত জামা-চাদরের বোঝা— মানবী নয়। এই গাড়িতেই মেয়েটিকে হাসপাতালে লইয়া চলিয়াছিল। সে বসিয়া নাই, তার দেহের দু-এক ফোঁটা রক্ত গাড়ির সিটে লাগিয়া থাকিতে পারে।

শহর ছাড়িয়া নদীর ধারে ধারে গাড়ি ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিল। হেডলাইট জ্বালিয়া গাড়ি ছুটিতেছে। চারিদিকের নিঃশব্দতাকে পিষিয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া খোয়া-তোলা রাস্তার উপর চাকার পেষণে কর্কশ সকরুণ আর্তনাদ উঠিতেছে। একটি পল্লী-কিশোরীর এই দিনকার সকল সাধ-বাসনা বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাকার সামনে সে যেন বুক পাতিয়া দিয়াছে। বাহিরে

'ঘন তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি—জনশূন্য মাঠ—কোনদিকে আলোর কণিকা নাই। সৃষ্টির আদি-যুগের অন্ধকারলিপ্ত নীহারিকামণ্ডলীর মধ্য দিয়া বেণুধর যেন বিদ্যুতের গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর পাশে পাশে পাল্লা দিয়া ছুটিয়া মরিতেছে নিঃশব্দচারিণী মৃত্যুরূপা তার বধূ। লাল বেনারসিতে রূপের রাশি মুড়িয়া লজ্জায় ভাঙিয়া শতখান হইয়া এখানে এক কোণে তার বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু একটি মুহূর্তের ঘটনার পরে এখন তার পথ হইয়াছে সীমাহীন বিপুল শূন্যতা—রাত্রির অন্ধকার মথিত করিয়া বাতাসের বেগে ফরফর শব্দে তার পরনের কালো কাপড় উড়ে, পায়ের আঘাতে জোনাকি ছিট-কাইয়া যায়, গতির বেগে সামনে ঝুঁকিয়া-পড়া ঘন চুল-ভরা মাথাটি —মাথার চারি পাশ দিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া গড়াইয়া বৃষ্টি বহিয়া যায়, এলোচুল উড়ে—দিগন্তব্যাপী ডগমগে লাল চুল।

দুই হাতে মাথা টিপিয়া চোখ বুজিয়া বেণুধর পড়িয়া রহিল। গাড়ি চলিতে লাগিল। খানিক পরে পথের ধারে এক বটতলায় থামিয়া হাটুরে-চালার মধ্যে বাঁশের মাচায় অনেকক্ষণ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে মন কিছু শান্ত হইলে বাসাবাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

নীলমাধব প্রভৃতি অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। বরযাত্রীরা অনেকে মেল-ট্রেন ধরিতে সোজা স্টেশনে গিয়াছে। কেবল কয়েকজন মাত্র —যাঁরা খুব নিকট আত্মীয়—বৈঠকখানার পাশের ঘরে বালিশ কাঁথা পুঁটুলি বই যা-হয় একটা-কিছু মাথায় দিয়া যে যার মতো শুইয়া পড়িয়াছেন। অনেক রাত্রি। হেরিকেনের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে।

আলোর সামনে ঠিক মুখোমুখি নির্বাক নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে বসিয়া নীলমাধব ও শীতল ঘটক।

বেণুকে দেখিয়া নীলমাধব উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, কাউকে

কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লে—মোটর নিয়ে গিয়েছ শুনে ভাবলাম, বাসাতেই এসেছ। এখানে এসে দেখি তা নয়। ভারি ব্যস্ত হয়েছিলাম। জজবাবুর বাড়ি বিজয় গিয়ে বসে আছে এখনো।

বেণুধর বলিল, বড্ড মাথা ধরল, ফাঁকায় তাই খানিকটে ঘুরে এলাম।

বলে যাওয়া উচিত ছিল—বলিয়া নীলমাধব চুপ করিলেন। ছেলে নিশ্চল দাড়াইয়া আছে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, তোমার খাওয়া হয় নি। দক্ষিণের-কোঠায় খাবার ঢাকা আছে, বিছানা করা আছে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়—রাত জাগবার দরকার নেই।

নীলমাধবের ভয়ে ঘরে গিয়া ঢাকা খুলিয়া খাবার খানিকটা সে নাড়াচাড়া করিল, মুখে তুলিতে পারিল না।

দালানের পিছনে কোথায় কী ফুল ফুটিয়াছে, একটা উগ্র মিষ্ট গন্ধের আমেজ। মিটমিটে আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন আধ-অন্ধকারে চারি দিক চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, ঘর ভরিয়া কে-একজন বসিয়া আছে, তাহাকে ধরিবার জো নাই—অথচ তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য বন্যার মতো ঘর ছাপাইয়া যাইতেছে। কোণের দিকে দলিলপত্র-ভরা সেকেলে বড় ছাপবাক্সের আবডালে নিবিড় কালো বড় বড় দুটি চোখে অভুক্ত খাবারের দিকে বেদনাহত ভাবে চাহিয়া নীরব দৃষ্টিতে তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে। আলো নিভাইতেই সেই দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য অকস্মাৎ বেণুধরকে কঠিন ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

বাহিরের বৈঠকখানায় কথাবার্তা আরম্ভ হইল। শীতল ঘটক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, পোড়াকপালি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল!

তারপর চুপ। অনেকক্ষণ আর কথা নাই।

শীতল আবার বলিতে লাগিল, বুদ্ধিশ্রী ছিল মেয়েটার। মনে আছে কর্তাবাবু, সেই পাকা দেখতে গিয়ে আপনি বললেন, আমার মা নেই, একজন মা খুঁজতে এসেছি। আপনার কথা শুনে মেয়েটি কেমন ঘাড় নিচু করে রইল।

নীলমাধব গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থাম শীতল।

একেবারেই কথা বন্ধ হইল, দু'জনে চুপচাপ। আলো জ্বলিতে লাগিল। আর ঘরের মধ্যে বেণুধরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। জীবনকালের মধ্যে কোন দিন যাহাকে দেখে নাই মৃত্যুপথবর্তিনী সেই কিশোরী মেয়ের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্খাগুলি হঠাৎ যেন মাঠ বাড়ি বাগিচা ও এত রাস্তা পার হইয়া জানালা গলিয়া অন্ধকার ঘরখানির মধ্যে তাহার পদতলে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে লাগিল।

তারপর কখন বেণু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জানালা খোলা, শেষ রাত্রে পূর্বদিগন্তে চাঁদ উঠিয়া ঘর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছে, দিগন্তবিসারী ভৈরব শান্ত জ্যোৎস্নার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কী একটা ভারি ভুল হইয়া যাইতেছে···হঠাৎ বড় ঘুম আসিয়া পড়িয়াছিল, কে আসিয়া কতবার তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া বেড়াইতেছে। ঘুমের আলস্য তখনও বেণুধরের সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে। তাহার তন্দ্রাবিবশ মনের কল্পনা ভাসিয়া চলিল—

ঠক ঠক—ঠক—

খিল-আঁটা কাঠের কবাটের ওপাশে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি এখনো যে ক্ষীণ আঘাত করিতেছে, বেণুধর তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পায়। হাতের চুড়িগুলি গোছার দিকে টানিয়া আনা, চুড়ি বাজিতেছে না। শেষ প্রহর অবধি জাগিয়া জাগিয়া তাহার শ্রান্ত দেহ আর বশ মানে না। চোখের কোণে কান্না জমিয়াছে। একটু আদরের কথা কহিলে একবার নাম ধরিয়া ডাকিলে এখনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। ফিস-ফিস করিয়া বধূ বলিতেছে, দুয়োর খুলে দাও গো, পায়ে পড়ি—

উঠিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনা দরকার। কিন্তু মনে যতই তাড়া, দেহ আর উঠিয়া গিয়া কিছুতেই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে রাজি নয়। বেণুধর দেখিতে লাগিল, বাতাস লাগিয়া গাছের উপরের লতা যেমন পড়িয়া যায়, ঝুপ করিয়া তেমনি দোর-গোড়ায় বধূ পড়িয়া গেল।

সমস্ত পিঠ ঢাকিয়া পা অবধি তাহার নিবিড় তিমিরাবৃত চুলের রাশি এলাইয়া পড়িয়াছে।···বেণুধর দেখিতে লাগিল।

ক্রমে ফরসা হইয়া আসে। আম-বাগানের ডালে ডালে সত্ত-ঘুমভাঙা পাখির কলরব। ও-ঘর হইতে কে কাসিয়া কাসিয়া উঠিতেছে। দিনের আলোর সঙ্গে মানুষের গতিবিধি স্পষ্ট ও প্রখর হইতে লাগিল। বেণুধর উঠিয়া পড়িল।

সকালের দিকে সুবিধা মতো একটা ট্রেন আছে। অথচ নীলমাধব নিশ্চিন্তে পরম গম্ভীরভাবে গড়গড়া টানিতেছিলেন।

বেণু গিয়া কহিল, সাতটা বাজে—

বিনাবাক্যে নীলমাধব তুটো টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, চা-টা তোমরা দোকান থেকে খেয়ে নাও।

বাড়ি যাওয়া হবে না?

না—

বলিয়া তিনি গড়গড়ার নল রাখিয়া কী কাজে বাহিরে যাইবার উত্তোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বেণুধর ব্যাকুল কণ্ঠে পিছন হইতে প্রশ্ন করিল: কবে যাওয়া হবে? এখানে কতদিন থাকতে হবে আমাদের?

মুখ ফিরাইয়া নীলমাধব ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন।

সে মুখে কী দেখিলেন, তিনিই জানেন—ক্ষণকাল মুখ দিয়া তাঁহার কথা সরিল না। শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, শীতল ঘটক ফিরে না এলে সে তো বলা যাচ্ছে না।

অনতিপরেই বৃত্তান্ত জানিতে বাকি রহিল না। শীতল ঘটক গিয়াছে তাহিরপুরে। গ্রামটা নদীর আড়পারে ক্রোশখানেকের মধ্যেই। ওখানে কিছুদিন একটা কথাবার্তা চলিয়াছিল। খুব বনিয়াদী গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে। কিন্তু ইদানীং কৌলীন্যটুকু ছাড়া সে পক্ষের অন্য বিশেষ কিছু সম্বল নাই। অতএব নীলমাধব নিজেই পিছাইয়া আসিয়াছিলেন।

বিজয়কে আড়ালে ডাকিয়া সকল আক্রোশ বেণু তাহারই উপর মিটাইল। কহিল, কশাই তোমরা সব।

অথচ সে একেবারেই নিরপরাধ। কিন্তু সেই-তর্ক না করিয়া বিজয় সান্ত্বনা দিয়া কহিল, ভয় নেই ভাই, ও কিচ্ছু হবে না দেখো। ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, সে কি হয় কখনো? কাকার যেমন কাণ্ড!

কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল, ঘটক হাসিমুখে হন-হন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সামনে পাইয়া সুসংবাদটা তাহাদেরই সর্বাগ্রে দিল।

পাকাপাকি করে এলাম ছোটবাবু—

তবু বিজয় বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, পাকাপাকি করে এলে কি রকম? ঘণ্টা দুই-তিন আগে বেরুলে—আগে কোন খবরাখবর দেওয়া ছিল না। এর মধ্যে ঠিক হয়ে গেল?

শীতল সগর্বে নিজের অস্থিসার বুকের উপর একটা থাবা মারিয়া কহিল, এর নাম শীতল ঘটক, বুঝলেন বিজয় বাবু, চল্লিশ বছরের পেশা আমার। কিছুতে রাজি হয় না—হেনো-তেনো কত কি আপত্তি। ফুস-মন্ত্রে সমস্ত জল করে দিয়ে এলাম।

বলিয়া শূন্যে মুখ তুলিয়া ফুৎকার দিয়া মন্ত্রটার স্বরূপ বুঝাইয়া দিল।

বেণুধর কহিল, আমি বিয়ে করব না।

শীতল অবাক হইয়া গেল। সে কেবল অপর পক্ষের কথাটাই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। একবার ভাবিল, বেণুধরও পরিহাস করিতেছে।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এদিক-ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সন্দিগ্ধ স্বরে বলিতে লাগিল, তাই কখনো হয় ছোটবাবু? লক্ষ্মী-ঠাকুরুনের মত মেয়ে। ছবি নিয়ে এসেছি, মিলিয়ে দেখুন। কালকের ও-মেয়ে এর দাসী-বাঁদীর যুগ্যি ছিল না।

বেণুধর কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিল, আমি যা বলবার বলে দিইছি শীতল। তুমি বাবাকে আমার কথা বলো।

বলিয়া আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ক্ষণপরে তাহার ডাক পড়িল।

নীলমাধব বলিলেন, শুনলাম বিয়েয় তুমি অনিচ্ছুক?

বেণু মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলমাধব বলিতে লাগিলেন, তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে বল?

কোন প্রকারে মরীয়া হইয়া বেণুধর বলিয়া উঠিল, কালকের সর্বনেশে কাণ্ডে আমার মন কী রকম হয়ে গেছে বাবা, আমি পাগল হয়ে যাব। আর কিছুদিন সময় দিন আমায়।

বলিতে বলিতে স্বর কাঁপিতে লাগিল। এক মুহূর্ত সামলাইয়া লইয়া বলিল, মরা মানুষ আমার পিছু নিয়েছে।

ভ্রূ বাঁকাইয়া নীলমাধব ছেলের দিকে চাহিলেন। একটুখানি নরম হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর একদিকের সর্বনাশটা ভাবো একবার! বাড়িতে কুটুম্ব গিস-গিস করছে, সতের গ্রাম নেমতন্ন। বউ দেখবে বলে সবাই হাঁ করে আছে। যেমন-তেমন ব্যাপার নয়, এত বড় জেদাজেদির বিয়ে। আর চৌধুরীদের মেজকর্তা আসবেন—

অপমানের ছবিগুলি চকিতে নীলমাধবের মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। চৌধুরীদের মেজকর্তা অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি, তিলার্ধ দেরী না করিয়া জপের মালা হাতে লইয়াই খড়ম খট-খট করিতে করিতে সমবেদনা জানাইতে আসিলেন—আসিয়া নিতান্ত নিরীহ মুখে উচ্চ কণ্ঠে এক-হাট লোকের মধ্যে বৃদ্ধ অতি-গোপনে জিজ্ঞাসা করিবেন: বলি ও নীলমাধব, আসল কথাটা বলো দিকি, বিয়ে এবারও ভাঙল? মেয়ে কি তারা অন্য জায়গায় বিয়ে দেবে?···

ভাবিতে ভাবিতে নীলমাধব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,

না বেণুধর, বউ না নিয়ে বাড়ি ফেরা হবে না। পরশুর আগে দিন নেই। তুমি সময় চাচ্ছিলে—বেশ তো মাঝের এই দুটো দিন থাকল। এর মধ্যে নিশ্চয় মন ভালো হয়ে যাবে।

বারোয়ারি মাঠে যাত্রা আসিয়াছে। বিকাল হইতে গাওনা শুরু। বেণুধর সমবয়সি জন দুই-তিনকে পাকড়াইয়া বলিল, চল যাই।

বিজয় বলিল, আমার যাওয়া হবে না তো। বিস্তর জিনিসপত্তর বাঁধাছাদা করতে হবে। রাত্রে ফিরে যাচ্ছি।

কেন?

গ্রামে গ্রামে খবর দিতে হবে, বউভাতের তারিখ দুটো দিন পিছিয়ে গেল। কাকা বললেন, তুমিই চলে যাও বিজয়।

গাড়ি সেই কোন রাতে—আমরা থাকব বড় জোর এক ঘণ্টা কি দড় ঘণ্টা। চলো চলো—

বেণুধর ছাড়িল না, ধরিয়া লইয়া গেল।

পথের মধ্যে বিজয়কে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে পরশু দিন ঠিক হল?

হ্যাঁ—

পরশু রাত্রে?

তা ছাড়া কি।

চুপ করিয়া খানিক কী ভাবিয়া বেণুধর করুণ ভাবে হাসিয়া উঠিল। লল, রাত্রি আসছে, আর আমার ভয় হচ্ছে। তুমি বিশ্বাস রবে না বিজয়, ঐ অপঘাতে-মরা মেয়েটা কাল সমস্ত রাত আমায় লাতন করেছে।

আবার একটু স্তব্ধ থাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, া ব্যাপারটা আর বিশ্বাস করছি নে। এত সাধ-আহ্লাদ-লবাসা পলক ফেলতে না ফেলতে উড়িয়ে-পুড়িয়ে চলে যাবে—সে

কি হতে পারে ? মিছে কথা। এ আমার অনুমানের কথা নয় বিজয়, কাল থেকে স্পষ্ট করে জেনেছি।

বিজয় ব্যাকুল হইয়া বলিল, তুমি এসব কথা আর বোলো না ভাই, আমাদের শুনলে ভয় করে।

ভয় করে ? তবে বলব না।

বলিয়া বেণু টিপি-টিপি হাসিতে লাগিল। বলিল, কিন্তু যাই বলো, এই শহরে পড়ে থাকা আমাদের উচিত হয় নি—দূরে পালানো উচিত ছিল। এই আধক্রোশের মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটল তো!

যাত্রা দেখিয়া বেণু অতিরিক্ত রকম খুশি হইল। ফিরিবার পথে কথায় কথায় এমন হাসি-রহস্য—যেন সে মাটি দিয়া পথ চলিতেছে না। তখন সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। পথের উপর অজস্র কামিনী-ফুল ফুটিয়াছে। ডালপালাসুদ্ধ তাহারা অনেকগুলি ভাঙিয়া লইল।

বলিল, খাসা গন্ধ! বিছানায় ছড়িয়ে দেবো।

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, ফুলশয্যার দেরি আছে তো—

কোথায় ? বলিয়া বেণু প্রচুর হাসিতে লাগিল। বলিল, এ-পক্ষের দিন রয়েছে তো কাল। আর তাহিরপুরেরটার—ও বিজয়, তোমাদের নতুন সম্বন্ধের ফুলশয্যার দিন করেছে কবে ?

বিজয় রীতিমতো রাগিয়া উঠিল : ফের ঐ কথা! এ-পক্ষ ও-পক্ষ—বিয়ে তোমার ক'টা হয়েছে শুনি ?

আপাতত একটা। কাল যেটা হয়ে গেল। আর একটার আশায় আছি।

বিজয়ের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বেণু বলিতে লাগিল, ও বিজয়, ভয় পেলে নাকি ? ভয় নেই, আজ সে আসবে না। আজকে কালরাত্রি—বউয়ের দেখা করবার নিয়ম নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ প্রফুল্ল ভাবে বেণুধর শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আসে না। আলো নিভাইয়া দিল। কিছুতে ঘুম আসে

না। পাশে কোন বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘড়ি বাজিয়া যাইতেছে। চারিদিক নিশুতি। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমের সাধনা করিয়া কাহার উপর বড় রাগ হইতে লাগিল। রাগ করিয়া গায়ের কম্বল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া জোরে জোরে বাহিরে পায়চারি করিতে লাগিল। খণ্ড-চাঁদ ক্রমশ আম-বাগানের মাথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। আবার সে ঘরে ঢুকিল। বিছানার পাশে গিয়া মনে হইল, ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া লঘুপায়ে কে কোন দিকে পলাইয়া গেল। বাতাসে বাগিচার গাছপালা খস-খস করিতেছে। বেণুধর ভাবিতে লাগিল, নূতন কোরা-কাপড় পরিয়া খস-খস করিতে করিতে এক অদৃশ্যচারিণী বনপথে বাতাসে বাতাসে দ্রুতবেগে মিলাইয়া গেল।

পরদিন তাহিরপুরের পাত্রীপক্ষ আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। হাসিমুখেই আশীর্বাদের আংটি সে হাত পাতিয়া লইল। মনে মনে বাপের বহুদর্শিতার কথা ভাবিল। নীলমাধব সত্যই বলিয়াছিলেন—এই দু'টা দিন সময়ের মধ্যেই মন তাহার আশ্চর্য রকম ভাল হইয়া উঠিয়াছে। চুরি করিয়া এক ফাঁকে বাপের ঘর হইতে পাত্রীর ছবিটা লইয়া আসিল। মেয়ে সুন্দরী বটে! প্রতিমার মতো নিখুঁত নিটোল গড়ন।

সেদিন একখানা বই পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শিয়রে তেপায়ার উপর ভাবী বধূর ছবিখানি। ম্লান দীপালোকিত চুণকাম-খসা উঁচু দেয়াল, গম্বুজের মতো খিলান-করা সেকেলে ছাত—তাহারই মধ্যে মিলনোৎকণ্ঠিত নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের সহগামী হইয়া অনেক রাত্রি অবধি সে বই পড়িতে লাগিল।

একবার কী রকমে মুখ ফিরাইয়া বেণুধর স্তম্ভিত হইয়া গেল। স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একেবারে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ—তাহার মধ্যে এক বিন্দু সন্দেহ করিবার কিছু নাই—জানালার শিকের মধ্য দিয়া হাত

গলাইয়া চাঁপার কলির মতো পাঁচটি আঙুল লীলায়িত ভঙ্গিতে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। ভাল করিয়া তাকাইতেই বাহিরের নিকষ-কালো অন্ধকারে হাত ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া জানালায় আসিল। আর কিছুই নাই, নৈশ বাতাসে লতাপাতা দুলিতেছে। সজোরে সে জানালায় খিল আঁটিয়া দিল।

আলোর জোর বাড়াইয়া দিয়া বেণুধর পাশ ফিরিয়া শুইল। চটা-ওঠা দেয়ালের উপব কালের দেবতা কত কি নক্সা আঁকিয়া গিয়াছে। উল্টা করা তালের গাছ···একটা মুখের আধখানা ঝুঁটিওয়ালা অদ্ভুত আকারেব জানোয়ার আর একটা কিসেব টুপি চাপিয়া ধরিয়া আছে--ঝুলকালি ও মাকড়শার-জালের বন্দীশালায় কালো কালো শিকের আড়ালে কত লোক যেন আটক হইয়া রহিয়াছে ··

চোখ বুজিয়া সে দেখিতে লাগিল

অনেক দূরে মাঠের ওপারে কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া সারি সারি মানুষ চলিয়াছে—পিঁপড়ার সারির মতো মানুষের অনন্ত শ্রেণী। লোকালয়ের সীমানায় আসিয়া কে-একজন হাত উঁচু করিয়া কি বলিল। মুহূর্তকাল সব স্থির। আবার কী সঙ্কেত হইল। অমনি দল ভাঙিয়া নানাজনে নানাদিকে পথ-বিপথ ঝোপজঙ্গল আনাচ-কানাচ না মানিয়া ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই রাত্রে আঙিনার ধূলায় কোথায় এক পরম দুঃখিনী এলাইয়া পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া দাপাদাপি করিতেছে ঃ

ও মা—মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমাণিক রাজরাণী মা!

অন্ধকারের আবছায়ে ছোট ঘুলঘুলির পাশে তন্বী কিশোরীটি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আড়ি পাতিয়া বসিয়া আছে। শিয়রে নূতন-বধূ চুপটি করিয়া বাসর জাগে। বর বুঝি ঘুমাইল।···

বেণুধর উঠিয়া বসিয়া পরম স্নেহে স্মিতমুখে শিয়রে তেপায়ার উপরের ছবিখানির দিকে তাকাইল। কাল সারা রাত্রি তাহারা জাগিয়া কাটাইবে।

রুদ্ধ জানালায় সহসা মৃদু করাঘাত শুনিয়া বেণুধর চমকিয়া উঠিল। শুনিতে পাইল, ভয়ার্ত চাপা-গলায় ডাকিয়া কে যেন কি বলিতেছে। একটি অসহায় প্রীতিমতা বালিকা বাপ-মা এবং চেনা-জানা সকল আত্মীয়-পরিজন ছাড়িয়া আসিয়া ঐ জানালার বাহিরে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ বেণুধর তিলার্ধ দেরী করিল না। দুয়ার খুলিয়া দেখে, ইতিমধ্যে বাতাস বাড়িয়া ঝড় বহিতে শুরু হইয়াছে। সন-সন করিয়া ঝড দালানের গায়ে পাক খাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

এসো—

উঁহু।

এসো—

না।

বাতাসে দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

বেণুধর নির্ণিরীক্ষ অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য পলায়নপরার পিছনে ছুটিল। ঝোড়ো হাওয়ায় কথা না ফুটিতে কথা উড়াইয়া লইয়া যায়। তবু সে যুক্তকরে বারম্বার এক অভিমানিনীর উদ্দেশ্যে কহিতে লাগিল, মিছে কথা, আমি বিয়ে করব না, আমি যাব না কাল। তুমি এসো —ফিরে এসো-

নিশীথ রাত্রি।

মেঘ-ভরা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ভৈরবের বুকে যেন প্রলয়ের জোয়ার লাগিয়াছে। ডাক ছাড়িয়া কুল ছাপাইয়া জল ছুটিয়াছে। বেণুধর নদীর কূলে কূলে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃত্যু ও জীবনের সীমারেখা এই পরম মুহূর্তে প্রলয়-তরঙ্গে লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এই ক্ষণ প্রতিদিন আসিয়া থাকে। দিনের অবসানে সন্ধ্যা—তারপর রাত্রি—পলে পলে রাত্রির বক্ষস্পন্দন বাড়ে—তারপর অনেক, অনেক—অনেকক্ষণ পরে মধ্য-আকাশ হইতে একটি নক্ষত্র বিদ্যুৎগতিতে খসিয়া পড়ে, ঝন-ঝন করিয়া মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া যায়, পৃথিবীর মানুষের শিয়রে ওপারের লোক দলে দলে আসিয়া বসে, ভালবাসে, আদর করে, স্বপ্নের মধ্য দিয়া কত কথা কহিয়া যায়—

আজ স্বপ্নলোকের মধ্যে নয়, জাগ্রত দুই চক্ষু দিয়া মৃত্যুলোক-বাসিনীকে সে দেখিতে পাইয়াছে। দু'টি হাত নিবিড় করিয়া ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। দিগন্তব্যাপ্ত মেঘবরণ চুলের উপর ডগডগে লাল কয়েকটি রক্তবিন্দু প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে আলেয়ার মতো বেণুধরকে দূর হইতে দূরে ছুটাইয়া লইয়া চলিল।

গোলাবাড়ির সার্কিট হাউস

লীলা মজুমদার

যারা শহরে বাস করে তারা দু চোখ বুঁজে জীবনটা কাটায়। কোনো একটা বিদেশী তেল কোম্পানির সব থেকে ছোট সাহেব অরূপ ঘোষের মুখে এ-কথা প্রায়ই শোনা যেত। সাহেব বলতে যে বাঙ্গালী সাহেব বোঝাচ্ছে, আশা করি সে-কথা কাউকে বলে দিতে হবে না। বিলিতী বড় সাহেব আজকাল যদি বা গুটিকতক দেখা যায়, ছোট সাহেব মানেই দিশী। তবে অরূপের বুকের পাটাও যে কারো চেয়ে নেহাৎ কম, এ-কথা তার শত্রুরাও বলবে না।

সমস্ত বিহার, ওড়িষ্যা আর পশ্চিমবাংলা জুড়ে যে অজস্র গাড়ি চলার ভালোমন্দ পথ আর অগুন্তি রাত কাটাবার আস্তানা আছে, এ বিষয়ে যারা ও-সব জায়গায় না গিয়েছে, তাদের কোনো ধারণাই নেই। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার গল্প বলে তারা। বিশেষ করে কোনো নির্জন আস্তানায় দু-চার জনা যদি অতর্কিতে একত্র হয়। সেদিন যেমন হয়েছিল। বলা বাহুল্য অরূপ ছিল তাদের একজন।

বিদেশী তেল কোম্পানীর ছোট বড় সাহেবদের তিন বছরের বেশি পুরনো গাড়ি চড়ে বেড়ানো নিতান্ত নিন্দনীয়। কাজেই অরূপের গাড়িটা খুব পুরনো ছিল না। কিন্তু হলে হবে কি, দুর্ভোগ কপালে থাকলে তাকে এড়ানো সহজ কথা নয়, কাজেই এই আস্তানায় পৌঁছতে শেষ বারো মাইল আসতে, তার দেড় ঘণ্টা লেগেছিল এবং পঁচিশবার নামতে হয়েছিল। ফুয়েল পাম্পের গোলমাল, সেটি না সারালেই নয়। অথচ খুদে অখ্যাত বিশ্রামাগারের সামনের নদীর মাথায় কোথাও প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে থাকবে, তার ফলে নদী ফেঁপে ফুলে একাকার। পুরনো লড়ঝড়ে পুল থরহরি কম্পমান। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক ছাড়া কেউ তাতে চড়তে রাজি হবে না।

তবে এর চাইতে অনেক মন্দ জায়গাতেও রাত কাটিয়েছে অরূপ। সেই কথাই হচ্ছিল। ম্যানেজার ছাড়া, শুধু একটা চাকর। তাছাড়া তিনজন আগন্তুক; অরূপকে নিয়ে চারজন। ম্যানেজার মানে কেয়ার টেকার। এখানে কেউ থাকেও না, খায়-দায়ও না। হয়তো দৈবাৎ অসুবিধায় পড়লে রাত কাটিয়ে যায়। নিজেদের খাবার দাবার খায়।

বনবিভাগের ইন্সপেক্টর কালো সাহেব ডি-সিল্‌ভা বলল, আরে তোমরাও তো খাও-দাও, ঘুমোও। তা খায় সত্যিই। কেয়ার-টেকার খৃশ্চান; যে বেয়ারা রাঁধে সে কেয়ার-টেকারের হুকুম পালে বটে; কিন্তু তার হাতে খায় না। নদীর ওপারে মাইল দেড়েক দূরে রবি গাঁও থেকে রসদ কিনে আনতে হয়। আজ আর কেউ নদী-পার হতে পারে নি। ভাঁড়ার ঠনঠন। তাছাড়া এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আর যে-কেউ এসে উঠলেই অমনি তার নফর হতে হবে, এমন যেন কেউ আশা না করে।

ডি-সিল্‌ভা পরিষ্কার বাংলা বলে, তার আদি নিবাস ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। এবার সে রেগে উঠল। "মাই ডিয়ার ফেলো, আমি তোমাদের মতো নই, আমি ইউরোপিয়ান, তোমাদের রাঁধাবাড়ার তোয়াক্কা রাখি না। আমার রসদ আমার সঙ্গে থাকে। আমি শুধু জানতে চাই এ জায়গাটা রাত কাটাবার পক্ষে নিরাপদ কিনা।"

অরূপ না হেসে পারল না। "বনের মধ্যে যার কাজ তার অত ভয় কিসের?"

তৃতীয় ব্যক্তির নাম নমসমুত্রম কি ঐ ধরনের কিছু। বোধ হয় পুলিশের লোক। ডি-সিল্‌ভার সঙ্গেই এসেছিল! সে সর্বদা ইংরেজি ছাড়া কিছু বলে না। এবার সে ব্যস্ত হয়ে বলল, "না, না, সে রকম ভয়ের কথা হচ্ছে না। আর হবেই বা কেন? তোমাদের মতো উৎসাহী ইয়ংমেন তো এ-সব বনের শ্রেষ্ঠ-সম্পদ বন্য জন্তু মেরে-কেটে সাবাড় করে এনেছে! ও অন্য ভয়ের কথা বলছে।"

অরূপ জুতোর ফিতে ঢিলে করে, মোজা সুদ্ধ পা টেনে বাইরে এনে, আঙ্গুলগুলো নেড়ে একটু আরাম বোধ করে বলল, "তাহলে কি রকম ভয়ের কথা, মশাই?" সে তেল কোম্পানির কর্মী, রাষ্ট্র ভাষা তার মুখে সহজে আসে। শুনে চতুর্থ ব্যক্তি দাড়ি নেড়ে বলল, "ঠিক, রাইট"। নমসমুদ্রম কাষ্ঠ হাসল—"এমন সব ভয়ের ব্যাপার যা বন্দুকের গুলিতে বাগ মানে না। ঠিক কি না?" ডি-সিল্‌ভা বলল, "অবিশ্যি আমার তাতে এসে যায় না। ইউরোপের লোকেরা এ-সব বিষয়ে অনেকটা উদার। তা-ছাড়া আমার পীরের দরজায় মানৎ করা আছে। আমার ক্ষতি করে কার সাধ্যি।"

সর্দারজি বললেন, "তবে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে বৈকি। এই যেমন গত বছর সবাই পই-পই করে বারণ করা সত্ত্বে আমাদের ট্রাক দুর্ঘটনার অকুস্থলে যাবার পথে মোপানির ডাক-বাংলায় রাত কাটালাম। বেশ ভালো ব্যবস্থা, আমার ডালরুটি আমার সঙ্গে থাকে, চৌকিদারটিও ভদ্র। আমার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আর স্নানের ঘরে জল আছে কি না অনুসন্ধান করেই সে হাওয়া হয়ে গেল। আমিও ক্লান্ত ছিলাম, মনে যথেষ্ট দুর্ভাবনাও ছিল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। মাঝরাতে উঠতে গিয়ে খাটের পাশে ঠ্যাং ঝুলিয়ে, ও হরি, তল পাই না! কিছুতেই আর মেজেতে পা ঠেকল না। নামাও হল না। কখন আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি যে-কে সেই। খাটের পাশে ঐ তো চটিজোড়া রয়েছে, কেউ ছোঁয়ও নি। ভালো করে ঘরটা পরখ করলাম, কেউ যে দড়ি বেঁধে কি অন্য উপায়ে খাটটাকে শূন্যে তুলবে, তার কোনো চিহ্ন নেই। ভাবলাম দুঃস্বপ্ন দেখেছি। কাপড়-চোপড় পরে চায়ের জন্য বসে বসে হয়রাণ হয়ে, চৌকিদারের ঘরে গিয়ে তাকে টেনে বের করলাম। আমাকে দেখে সে অবাক! সাহাব, আপনি—আপনি!! ও বাংলোতে তো কেউ রাত কাটায় না। কাল সেই কথাই বলতে চেষ্টা করছিলাম, আপনি কান-ও দিলেন না।

হাসলাম। আমার কনুইএর ওপরে কালিঘাটের মাদুলী বাঁধা সে কথা আর ব্যাটার কাছে প্রকাশ করলাম না। অবিশ্যি বলা বাহুল্য জায়গাটার নাম মোপানি নয়। সরকারের ক্ষতি করতে চাই না বলে নামটা পাল্টে দিলাম।”

নমসমুদ্রম বলল, “ডি-সিল্‌ভার আর আমার গত বছর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তবাইয়ের এক চা বাগানে এক বন্ধুব বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। বাগান-ও দেখব, ডি-সিল্‌ভা কি-সব গাছেব নমুনা সংগ্রহ কববে আর আমাব একটা তদন্তেব কাজ-ও ছিল। সন্ধ্যে থেকে চা-বাগানে কেমন একটি অস্বস্তি লক্ষ্য কবলাম। অন্ধকাবের আগেই আপিস-সেবেস্তাব কাবখানা-গুদোমখানাব দবজা-জানলা দুমদাম বন্ধ হয়ে গেল। কর্মীবা যে-যার কোযার্টাবে দোব দিল। অথচ এখানে কিছু এমন শীত পড়ে নি। আকাশে ফুটফুট করছে চাঁদ। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেবে, চা-বাগানেব মালিক ও নিজের শোবাব ঘবেব দিকে রওনা হলেন। আমাদেব বললেন, শুয়ে পড় তোমরা, এ সময়টা এ-সব জায়গা খুব ভালো নয়। শিকার? কাল সকালে ভালো শিকাবেব বন্দোবস্ত কবেছি। কিন্তু এত সকালে শোব কি! বন্দুক নিয়ে দুজনে বাথরুমেব দবজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

চা-বাগান গিয়ে ঘন বনে মিশেছে। মাঝখানে শুধু একটা উঁচু সেতু। সেটা পেরুনো আমাদের কাছে কিছুই নয়। পূর্ণিমায় কখনো বনের মধ্যে বেড়িয়েছেন? চাঁদের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে কুচিকুচি হয়ে, এখানে ওখানে পড়ে, হীরের মতো জ্বলে। কোথাও অন্ধকার জমে থক-থক করে। মনে হয় গাছগুলো জেগে উঠে চোখ মেলে চেয়ে দেখছে। গা শিরশির করে। কোথাও সাড়া-শব্দ নেই।

হঠাৎ দেখি আমাদের থেকে দশ হাত দূরে প্রকাণ্ড নেকড়ে বাঘ। এত বড় নেকড়ে এ-দেশে হয় জানতাম না। তার চোখ দিয়ে আলো

ঠিকরোচ্ছে, মুখটা একটু হাঁ করা, বড় বড় দাঁতের ফাঁক দিয়ে লালা ঝরছে। মাথাটা একটু নিচু করে, বিদ্যুৎবেগে সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার গায়ের চাপে ঝোপ-ঝাপগুলো সরে সরে যাচ্ছে।

আমার সারা গা হিমের মতো ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেল। বন্দুক তুলবার জোর পাচ্ছিলাম না। অথচ ডি-সিলভা নির্বিকার। যেই জানোয়ারটা আমাদের পার হয়ে গেল, মনে হল এমন সুযোগ আর পাব না। অমনি সম্বিৎ ফিরে এল। বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপলাম। খুব বেশি হলে জন্তুটা তখন আমাদের কাছ থেকে সাত আট হাত দূরে। আমাব অব্যর্থ লক্ষ্য। গুলিটা তার গা ফুঁড়ে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরদিন একটা গাছের গায়ে সেটাকে বিঁধে থাকতে দেখা গেছিল।

নেকড়েটা ভ্রূক্ষেপ-ও করল না। যেমন যাচ্ছিল তেমনি নিমেষের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমার কেমন মাথা ঘুরে গেল, ডি-সিলভা না ধরলে পড়েই যেতাম।" অরূপ বলল, "ভারি অদ্ভুত তো!"

ডি-সিল্‌ভা চুপ করে শুনছিল। এবার সে মুখ থেকে সিগারেট বের করে বলল, "অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! আমি তো ওর পাশে দাঁড়িয়েও নেকড়ে-ফেকড়ে কিছু দেখলাম না, খালি একটা বুনো গন্ধ নাকে এল। একফোঁটা রক্ত-ও মাটিতে দেখা গেল না। পরদিন ভোরে বাগানের মালিক শিকারের প্ল্যান বাতিল করে দিয়ে, এক রকম জোর করেই আমাদের রওনা করে দিলেন। খুব বিরক্ত মনে হল। তবে এ-সব ব্যাপারে কোনো এক্সপ্ল্যানেশন খুঁজবেন না, মশাই। নেহাৎ সমুদ্রের মা গুরু-বংশের মেয়ে, নইলে আর দেখতে হত না।"

অরূপ খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। এদের যত সব গাঁজাখুরি গল্প। ইন্টেলিজেন্সের অপমান। ডি-সিল্‌ভা বলল, "কি হল? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বনে—জঙ্গলে, নির্জন জায়গায় আমাদের

মতো ঘুরে বেড়ান কিছুদিন, তারপর দেখবেন সব অন্যরকম মনে হবে।"

সরদারজিও হাসলেন। বললেন, "বিশেষ করে যদি গোলাবাড়ির সার্কিট হাউসে একবারটি রাত কাটাতে হয়।" পরিবেশটি যে এই-রকম একটা আলোচনার-ই যোগ্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। এক দিকে ক্ষুব্ধ নদীর জল ফুঁসছে, অন্য দিকে বনের গাছ-পালায় বাতাসের আলোড়ন, তার উপর মেঘলা আকাশের নিচে চার দিক থেকে এরি মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাতাসটা থমথমে।

তবু, গোলাবাড়ির সার্কিট হাউসের নাম শুনে অরূপের হাসি পেল। সে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, "কেন, সেখানে কি হয়?" সরদারজি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "সেকি! আপনি থাকেন কোথায় যে অমন একটা সুখ্যাত জায়গার কথা জানেন না? ভাবতে পারেন সেখানে টাকা দিয়েও সরকার কখনো একটা চৌকিদার কি বেয়ারা রাখতে পারেনি? কেউ রাজি হয় নি। এটা একটা হিস্টরিকেল ফ্যাক্ট। বনের মধ্যে খাঁ-খাঁ খালি বাংলো পড়ে থাকত। নাকি সন্ধ্যের পর জন্তু-জানোয়ারও তার ত্রি-সীমানায় ঘেঁষত না!"

অরূপ এবার হেসে উঠল। "তাই নাকি? অথচ আমি সেখানে পরম আরামে গতকাল রাত্রিবাস করে এলাম। চৌকিদারের আপ্যায়ন আর বাবুর্চির রান্নার তুলনা হয় না। কোত্থেকে যে ঐ ব্যাক-অফ-বিয়ণ্ডে আমার জন্য মাশরুম আর অ্যাসপ্যারাগাস জোগাড় করে খাওয়াল তা ওরাই জানে। জানেন ফেঁদার-বেডে রাত কাটালাম। পোর্সিলেনের বাথ-টাব ভরে গরম জল দিল। একটা পয়সা নিল না দুজনার একজন-ও। কত মন-গড়া গল্পই যে আপনারা বিশ্বাস করেন তার ঠিক নেই। তবে এ-কথা সত্যি যে আমার গাইড বুকে ওটার নামেও পাশে লেখা আছে, অ্যাবাণ্ডনড ১৯০০এ-ডি!! গাইড-বুকের লেখক-ও তেমনি। নিশ্চয় আপনাদের কারো কাছ

থেকে ঐ তথ্য সংগ্রহ করেছিল।" বলে অরূপ খুব হাসতে লাগল। "আর তাই যদি বলেন, গাইডবুকে আমাদের আজকের এই আস্তানার-ও নাম নেই, তা জানেন? এটাই বা এল কোত্থেকে?"

অরূপ হাসলেও বাকিরা কেউ হাসল না। তারা বরং ত্রস্ত চঞ্চল হয়ে উঠে "ম্যানেজার!" ম্যানেজার!" বলে চ্যাঁচাতে লাগল। এলও ম্যানেজার এক মুহূর্তের জন্য, বেয়ারাটাও এল। কি যেন বলবার-ও চেষ্টা করল। তারপরেই সব ছায়া-ছায়া হয়ে গেল ঘর বারান্দা কিছুই রইল না। শুধু সামনে অন্ধকার বন আর পিছনে নদীব ফোঁস-ফোঁসানি। ওরা ধুপধাপ করে যে যাব গাড়িতে উঠে পড়ল। সরদারজি অরূপকে সঙ্গে টেনে নিলেন। পনেরো মাইল ফিরে গিয়ে ছোট শহরে ওরা রাত কাটিয়ে সকালে যে যার পথ দেখল। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

খালি অরূপকে জীপ ও লোকজন নিয়ে একটু বেলায় গিয়ে গাড়িটা উদ্ধার করতে হল। তখন নদীর জল কমে গেছে, পুল আর কাঁপবে না। গাড়ি সারানো হলে অরূপ পুল পার হয়ে ওদিকের পথ ধরল। তার আনা লোকগুলোর পাওনা চুকিয়ে জিজ্ঞাসা না করে পারল না, "নদীর তীরে গাছের নিচে শুকনো ফুল কেন?" তারা হেসে বলল, "গাঁয়ের লোকের কুসংস্কার মশাই। মাসে একবার এখানে বুনকিদেওর পুজো দেয়। তিনি নাকি বিপন্ন যাত্রীদের রক্ষা করেন।" অরূপ বলল, "আর গোলাবাড়ি সার্কিট হাউসের ব্যাপারটা কি?" তারা অবাক হয়ে বলল, "সে তো কবে ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।"

অনাথবাবুর ভয়

সত্যজিৎ রায়

অনাথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ট্রেনের কামরায়। আমি যাচ্ছিলাম রঘুনাথপুর হাওয়া বদলের জন্যে। কলকাতায় খবরের কাগজের অপিসে চাকরি করি। গত ক-মাস ধরে কাজের চাপে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তাছাড়া আমার লেখার শখ, দু-একটা গল্পের প্লটও মাথায় ঘুরছিল, কিন্তু এত কাজের মধ্যে কি আর লেখার ফুরসত জোটে? তাই আর সাত-পাঁচ না ভেবে দশ-দিনের পাওনা ছুটি আর দিস্তেখানেক কাগজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এত জায়গা থাকতে রঘুনাথপুর কেন তারও অবিশ্যি একটা কারণ আছে। ওখানে বিনা-খরচায় থাকার একটা ব্যবস্থা জুটে গেছে। আমার কলেজের সহপাঠী বীরেন বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে রঘুনাথপুরে। কফি হাউসে বসে ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায় এই আলোচনা প্রসঙ্গে বীরেন খুব খুশী হয়ে ওর বাড়িটা অফার করে বলল, 'আমিও যেতুম, কিন্তু আমার এদিকের ঝামেলা, বুঝতেই তো পারছিস। তবে তোর কোনই অসুবিধা হবে না। আমাদের পঞ্চাশ বছরের পুরনো চাকর ভরদ্বাজ রয়েছে ও-বাড়িতে, ও-ই তোর দেখাশুনো করবে। তুই চলে যা।'

গাড়িতে যাত্রী ছিল অনেক। আমার বেঞ্চিতে আমারই পাশে বসে ছিলেন অনাথবন্ধু মিত্র। বেঁটেখাটো মানুষটি, বছর পঞ্চাশেক আন্দাজ বয়স। মাঝখানে টেরিকাটা কাঁচাপাকা চুল, চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ, আর ঠোঁটের কোণে এমন একটা ভাব যেন মনের আনাচে-কানাচে সদাই কোন মজার চিন্তা ঘোরাফেরা করছে।

পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম ; ভদ্রলোককে হঠাৎ দেখলে মনে হবে তিনি যেন পঞ্চাশ বছরের পুরনো কোন নাটকের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সেজেগুজে তৈরী হয়ে এসেছেন। ও রকম কোট, ও ধরনের শার্টের কলার, ওই চশমা, আব বিশেষ করে ওই বুট জুতো—এসব আর আজকালকার দিনে কেউ পরে না।

অনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম তিনিও রঘুনাথপুর যাচ্ছেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কিংবা এও হতে পাবে যে ট্রেনের শব্দের জন্য তিনি আমাব প্রশ্ন শুনতে পাননি।

বীরেনের পৈতৃক ভিটেটি দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠল। বেশ বাড়ি। সামনে একফালি জমি—তাতে সবজি ও ফুলগাছ দুইই হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে অন্য কোন বাড়িও নেই, কাজেই পড়শীর উৎপাত থেকেও রক্ষা।

আমি আমার থাকার জন্যে ভরদ্বাজের আপত্তি সত্ত্বেও ছাতের চিলেকোঠাটি বেছে নিলাম। আলো বাতাস এবং নির্জনতা, তিনটেই অপর্যাপ্ত পাওয়া যাবে ওখানে। ঘর দখল করে জিনিসপত্র গোছাবার সময় দেখি আমার দাড়ি কামানোর খুর আনতে ভুলে গিয়েছি। ভরদ্বাজ শুনে বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে খোকাবাবু। এই তো কুণ্ডুবাবুর দোকান, পাঁচ মিনিটের পথ। সেখানে গেলেই পাবে'খন বিলেড।'

বিকেল চারটে নাগাদ চা-টা খেয়ে কুণ্ডুবাবুর দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি সেটি একটি ভালো আড্ডার জায়গা। দোকানের ভিতর দুটি বেঞ্চিতে বসে পাঁচ-সাতটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রীতিমত গল্প জমিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিত ভাবে বলছেন, 'আরে বাবু, এ তো আর শোনা কথা নয়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। আর তিরিশ বছর হয়ে গেল বলেই

কি সব মন থেকে মুছে গেল ? এসব স্মৃতি অত সহজে ভোলবার নয়, আর বিশেষ করে যখন হলধর দত্ত ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার মৃত্যুর জন্য আমি যে কিছু অংশে দায়ী, সে বিশ্বাস আমার আজও যায় নি।'

আমি এক প্যাকেট সেভেন-ও-ক্লক কিনে আরো দু-একটা অবান্তর জিনিষের খোঁজ করতে লাগলাম। ভদ্রলোক বলে চললেন, 'ভেবে দেখুন, আমারই বন্ধু আমারই সঙ্গে মাত্র দশ টাকা বাজি ধরে রাত কাটাত গেলো ওই উত্তর-পশ্চিমের: ঘরটাতে। পরদিন ফেরে না, ফেরে না—শেষটায় আমি, জিতেন বক্সি, হরিচরণ সা, আর আরো তিন-চারজন কে ছিল ঠিক মনে নেই—গেলুম হালদার বাড়িতে হলধরের খোঁজ করতে। গিয়ে দেখি বাবু ওই ঘরের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে মরে কাঠ হয়ে আছেন, তাঁর চোখ চাওয়া, দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে। আর সেই দৃষ্টিতে ভয়ের যা নমুনা দেখলুম, তাতে ভূত ছাড়া আর কী ভাবব বলুন ? গায়ে কোন ক্ষতচিহ্ন নেই, বাঘের আঁচড় নেই, সাপের ছোবল নেই, কিচ্ছু নেই। আপনারই বলুন এখন কী বলবেন।'

আরো মিনিট পাঁচেক দোকানে থেকে আলোচনার বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হল। ব্যাপারটা এই—রঘুনাথপুরের দক্ষিণপ্রান্তে হালদার বাড়ি বলে একটি দুশো বছরের পুরানো ভগ্নপ্রায় জমিদারী প্রাসাদ আছে। সেই প্রাসাদে—বিশেষ করে তার দোতলার উত্তর-পশ্চিম কোনের একটি ঘরে—নাকি অনেক কালের পুরনো একটি ভূতের আনাগোনা আছে। অবশ্য সেই ত্রিশ বছর আগে ভবতোষ মজুমদারের বন্ধু হলধর দত্তের মৃত্যুর পর আজ অবধি নাকি কেউ সে বাড়িতে রাত কাটায়নি। কিন্তু তাও রঘুনাথপুরের বাসিন্দারা ভূতের অস্তিত্ব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে। আর বিশ্বাস করার কারণও আছে যথেষ্ট। একে তো হলধর দত্তের রহস্যজনক মৃত্যু ; তার উপর

এমনিতেই হালদার বংশের ইতিহাসে নাকি খুনখারাপি আত্মহত্যা ইত্যাদির অনেক নজির পাওয়া যায়।

মনে মনে হালদারবাড়ি সম্পর্কে বেশ খানিকটা কৌতূহল নিয়ে দোকানের বাইরে এসেই দেখি আমার ট্রেনের আলাপী অনাথবন্ধু মিত্র মশাই হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে বললেন, 'শুনেছিলেন ওদের কথাবার্তা?'

বললাম, 'তা কিছুটা শুনেছি।'

'বিশ্বাস হয়?'

'কী? ভূত?'

'হ্যাঁ?'

'ব্যাপার কী জানেন, ভূতের বাড়িব কথা তো অনেকই শুনলাম, কিন্তু সে সব বাড়িতে থেকে নিজের চোখে ভূত দেখেছে, এমন লোক তো কই আজ অবধি একটিও মীট করলাম না। তাই ঠিক—'

অনাথবাবু একটু হেসে বললেন, 'একবার দেখে আসবেন নাকি?'

'কী?'

'বাড়িটা।'

'দেখে আসব মানে—'

'বাইরে থেকে আর কি। বেশি দূর তো নয়। বড় জোর মাইলখানেক। এই রাস্তা দিয়ে সোজা গিয়ে জোড়াশিবের মন্দির ছাড়িয়ে ডান হাতি রাস্তায় ঘুরে পোয়াটাক পথ।'

ভদ্রলোককে বেশ ইণ্টারেষ্টিং লাগছিল। আর তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে কী করব? তাই চললাম তার সঙ্গে।

হালদাবের বাড়িটা দূর থেকে দেখা যায় না, কারণ বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল। তবে বাড়ির গেটের মাথাটি দেখা যেতে থাকে পৌঁছানোর প্রায় দশ মিনিট আগে থেকেই। বিরাট ফটক, মাথার উপর ভগ্নপ্রায় নহবতখানা। ফটকের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকদূর রাস্তা গিয়ে তবে সদর দালান। দু-তিনটে

মূর্তি আর একটা ফোয়ারার ভগ্নাবশেষ দেখে বুঝলাম যে বাড়ি আর ফটকের মাঝখানের এই জায়গাটা আগে বাগান ছিল। বাড়িটি অদ্ভুত। কারুকার্যের কোন বাহার নেই তার কোন জায়গায়। কেমন যেন একটা বেঢপ চৌকোচৌকো ভাব বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে তার শেওলাবৃত দেযালে।

মিনিট কয়েক চেয়ে থাকার পর অনাথবাবু বললেন, 'আমি যতদূর জানি রোদ থাকতে ভূত বেরোয না।' তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, 'একবার চট করে সেই ঘরটা দেখে এলে হয় না।'

'সেই উত্তর-পশ্চিমের ঘর? যে ঘরে---'

'হ্যাঁ। যে ঘরে হলধর দত্তের মৃত্যু হয়েছিল।'

ভদ্রলোকের তো এসব ব্যাপারে দেখছি একটু বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহ।

অনাথবাবু বোধ হয় আমার মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরেই বললেন, খুব আশ্চর্য লাগছে, না? আসলে কী জানেন? আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই—'আমার রঘুনাথপুর আসার একমাত্র কারণই হল ওই বাড়িটা।'

'বটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা যে ভূতের বাড়ি, আমি কলকাতায় থাকতে সে খবরটা পেয়ে ভূতটিকে দেখব বলে এখানে এসেছি। আপনি সেদিন ট্রেনে আমার আসার কারণটা জানতে চাইলেন। আমি উত্তর না দিয়ে অভদ্রতা করলাম বটে, কিন্তু মনে মনে স্থির করেছিলাম যে উপযুক্ত সময় এলে অর্থাৎ আপনি কিরকম লোক সেটা আরেকটু জেনে নিয়ে, আসল কারণটা নিজে থেকেই বলব।'

'কিন্তু তাই বলে ভূতের পেছনে ধাওয়া করে একেবারে কলকাতা ছেড়ে—'

'বলছি, বলছি। ব্যস্ত হবেন না। আমার কাজটা সম্বন্ধেই তো বলা হয়নি এখনো আপনাকে। আসলে আমি ভূত সম্পর্কে

একজন বিশেষজ্ঞ। আজ পঁচিশ বছর ধরে এ ব্যাপার নিয়ে বিস্তর রিসার্চ করেছি। শুধু, ভূত কেন—ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউল্‌ফ, ভুডুইজম ইত্যাদি যা কিছু আছে তার সম্বন্ধে বইয়ে যা লেখে তার প্রায় সবই পড়ে ফেলেছি। সাতটা ভাষা শিখতে হয়েছে এসব বই পড়ার জন্যে। পরলোক তত্ত্ব নিয়ে লণ্ডনের প্রফেসর নর্টনের সঙ্গে আজ তিন বছর ধরে চিঠি লেখালেখি করেছি। আমার লেখা প্রবন্ধ বিলেতের সব নামকরা কাগজে বেরিয়েছে। আপনার কাছে বড়াই করে কী লাভ, তবে এটুকু বলতে পারি যে এদেশে এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী লোক বোধহয় আর নেই।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে তিনি যে মিথ্যে বলছেন বা বাড়িয়ে বলছেন, এটা আমার একবারও মনে হল না। বরং তাঁর সম্বন্ধে খুব সহজেই একটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল।

অনাথবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ভারতবর্ষের অন্তত তিনশো ভূতের বাড়িতে আমি রাত কাটিয়েছি!'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ। আর সেসব কিরকম কিরকম জায়গায় জানেন? এই ধরুন—জব্বলপুর, কার্সিয়ং, চেরাপুঞ্জি, কাঁথি, কাটোয়া, যোধপুর, আজিমগঞ্জ, হাজারিবাগ, সিউড়ি, বারাসত, আর কত চাই? ছাপ্পান্নোটা ডাকবাংলো আর কম করে ত্রিশটা নীলকুঠিতে আমি রাত্রি যাপন করেছি। এ ছাড়া কলকাতা এবং তার কাছাকাছির মধ্যে অন্তত পঞ্চাশখানা বাড়ি তো আছেই। কিন্তু—'

অনাথবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'ভূত আমায় ফাঁকি দিয়েছে। হয়তো, ভূতকে যারা চায় না, ভূত তাদের কাছেই আসে। আমি বার বার হতাশ হয়েছি। মাদ্রাজে ত্রিচিনপল্লীতে দেড়শ বছরের পুরনো একটা সাহেবদের পরিত্যক্ত ক্লাব-বাড়িতে ভূত একবার কাছাকাছি

এসেছিল। কিরকম জানেন? অন্ধকার ঘর, একফোঁটা বাতাস নেই, যতবারই মোমবাতি ধরাব বলে দেশলাই জ্বালাচ্ছি, ততবারই কে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে। শেষটায় তেরোটা কাঠি নষ্ট করার পর বাতি জ্বলল, এবং আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ভূত বাবাজী সেই যে গেলেন আর এলেন না। একবার কলকাতায় ঝামাপুকুরের এক হানা বাড়িতেও একটা ইন্টারেষ্টিং অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমার মাথায় তো এত চুল দেখছেন? অথচ, ওই বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে ভূতের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে মাঝরাত্রি নাগাদ হঠাৎ ব্রহ্মতালুর কাছটায় একটা মশার কামড় খেলাম। কী ব্যাপার? অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটি চুলও নেই! একেবারে মসৃণ মাথাজোড়া টাক! এ কি আমারই মাথা, না অন্য কারুর মাথায় হাত দিয়ে নিজের মাথা বলে মনে করেছি? কিন্তু মশার কামড়টা তো আমিই খেলাম। টর্চটা জ্বেলে আয়নায় দেখি টাকের কোন চিহ্নমাত্র নেই। আমার যে-চুল সে-চুলই রয়েছে আমার মাথায়। ব্যস, এই দুটি ছাড়া আর কোন ভূতুড়ে অভিজ্ঞতা এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হয়নি। তাই ভূত দেখার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম, এমন সময় একটা পুরনো বাঁধানো 'প্রবাসী'তে রঘুনাথ-পুরের এই বাড়িটার একটা উল্লেখ পেলাম। তাই ঠিক করলাম একটা শেষ চেষ্টা দিয়ে আসব।'

অনাথবাবুর কথা শুনতে শুনতে কখন যে বাড়ির সদর দরজায় এসে পড়েছি সে খেয়াল ছিল না। ভদ্রলোক তাঁর ট্যাঁকঘড়িটা দেখে বললেন, 'আজ পাঁচটা একত্রিশে সূর্যাস্ত। এখন সোয়া পাঁচটা। চলুন, রোদ থাকতে থাকতে একবার ঘরটা দেখে আসি।'

ভূতের নেশাটা বোধহয় সংক্রামক, কারণ আমি অনাথবাবুর প্রস্তাবে কোন আপত্তি করলাম না। বরঞ্চ বাড়ির ভিতরটা, আর বিশেষ করে দোতলার ওই ঘরটা দেখবার জন্য বেশ একটা আগ্রহ হচ্ছিল।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি বিরাট উঠোন ও নাটমন্দির! একশো – দেড়শো বছরে কত উৎসব, কত অনুষ্ঠান, কত পূজা-পার্বন, যাত্রা, কথকতা এইখানে হয়েছে, তার কোন চিহ্ন আজ নেই।

উঠোনের তিন দিকে বারান্দা। আমাদের ডাইনে বারান্দার যে অংশ, তাতে একটি ভাঙা পালকি পড়ে আছে, এবং পালকিটি ছাড়িয়ে হাত দশেক গিয়েই দোতলার যাবার সিঁড়ি।

সিঁড়িটা এমনই অন্ধকার যে উঠবার সময় অনাথবাবুকে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটি টর্চ বার করে জ্বালাতে হল। প্রায় অদৃশ্য মাকড়সার জালের ব্যূহ ভেদ করে কোন রকমে দোতলায় পৌছনো গেল। মনে মনে বললাম, এ বাড়িতে ভূত থাকা অস্বাভাবিক নয়।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিসাব করে দেখলাম বাঁ দিক দিয়ে সোজা চলে গেলে ওই যে ঘর, ওটাই হল উত্তর পশ্চিমের ঘর। অনাথবাবু বললেন, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলুন এগোই।'

এখানে বলে রাখি, বারান্দায় কেবল একটি জিনিষ ছিল—সেটি একটি ঘড়ি। যাকে বলে গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক। কিন্তু তার অবস্থা খুবই শোচনীয়—কাঁচ নেই, বড় কাঁটাটি উধাও, পেণ্ডুলামটি ভেঙে কাত হয়ে পড়ে আছে।

উত্তর পশ্চিমের ঘরের দরজাটি ভেজানো ছিল। অনাথবাবু যখন তাঁর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সন্তর্পনে ঠেলে দরজাটি খুলছিলেন তখন বিনা কারণেই আমার গা-টা ছমছম করছিল।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করলাম না। দেখে মনে হয় এককালে বৈঠকখানা ছিল। ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট টেবিল, তার কেবল পায়া চারখানাই রয়েছে, উপরের তক্তাটা নেই। টেবিলের পাশে জানলার দিকে একটি আরাম কেদারা। অবিশ্যি এখন আর সেটি আরামদায়ক হবে কিনা সন্দেহ, কারণ তার

একটি হাতল ও বসবার জায়গায় বেতের খানিকটা অংশ লোপ পেয়েছে।

উপরের দিকে চেয়ে দেখি ছাত থেকে ঝুলছে একটি টানাপাখার ভগ্নাংশ। অর্থাৎ, তার দড়ি নেই, কাঠের ডাণ্ডাটি ভাঙা এবং ঝালরের অর্ধেকটা ছেঁড়া।

এ ছাড়া ঘরে আছে একটি খাজকাটা বন্দুক রাখার তাক, একটি নলবিহীন গড়গড়া, আর দু'খানা সাধারণ হাতলভাঙা চেয়ার।

অনাথবাবু কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মনে হল খুব মনোযোগ দিয়ে কী একটা অনুভব করার চেষ্টা করছেন। প্রায় মিনিট খানেক পরে বললেন, 'একটা গন্ধ পাচ্ছেন ?'

'কী গন্ধ ?'

'মাদ্রাজী ধূপ, মাছের তেল, আর মড়াপোড়ার গন্ধ মেশানো একটা গন্ধ ?'

আমি বার দু'-এক বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস টানলাম। অনেকদিনের বন্ধ ঘর খুললে যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়, সে গন্ধ ছাড়া আর কোন গন্ধই পেলাম না। তাই বললাম, 'কই, ঠিক বুঝতে পারছি না তো।'

অনাথবাবু আরো একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি মেরে বললেন, 'বহুত আচ্ছা। এ গন্ধ আমার চেনা গন্ধ। এ বাড়িতে ভূত অবশ্যম্ভাবী। তবে বাবাজী দেখা দেবেন কি না দেবেন সেটা কাল রাত্রের আগে বোঝা যাবে না। চলুন।'

অনাথবাবু স্থির করে ফেললেন যে, পরদিনই তাঁকে এ ঘরে রাত্রি বাস করতে হবে। ফেরার পথে বললেন, 'আজ থাকলুম না কারণ কাল অমাবস্যা—ভূতের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত তিথি। তাছাড়া দু'-একটা জিনিষ সঙ্গে রাখা দরকার। সেগুলো বাড়িতে রয়ে গেছে, কাল নিয়ে আসব। আজ সার্ভেটা করে গেলুম আর কি।'

ভদ্রলোক আমায় বাড়ি অবধি পৌছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, 'আর কাউকে আমার এই প্ল্যানের কথা বলবেন না যেন। এদের কথাবার্তা তো শুনলুম আজকে—যা ভয় আর যা প্রেজুডিস এদের, জানলে পরে হয়তো বাধাটাধা দিয়ে আমার প্ল্যানটাই ভেস্তে দেবে। আর—হ্যাঁ, আরেকটা কথা। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে বললুম না বলে কিছু মনে কববেন না। এসব ব্যাপাব, বুঝলেন কিনা, একা না হলে ঠিক জুতসই হয় না।'

পরদিন দুপুরে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেও লেখা খুব বেশিদূর এগোল না। মন পড়ে রইল হালদার বাড়ির ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটায়। আর রাত্রে অনাথবাবুর কী অভিজ্ঞতা হবে সেই নিয়ে একটা অশান্তি আর উদ্বেগ রয়েছে মনের মধ্যে।

বিকেলে অনাথবাবুকে হালদার বাড়ির ফটক অবধি পৌছে দিলাম। ভদ্রলোকের গায়ে আজ একটা কালো গলাবন্ধ কোট, কাঁধে জলের ফ্লাস্ক আর হাতে সেই কালকের তিন সেলের টর্চ। ফটক দিয়ে ঢুকবার আগে কোটের দু'পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে দুটো বোতল বার করে আমায় দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন—এটিতে রয়েছে আমার নিজের ফরমুলায় তৈরি তেল—শরীরের অনাবৃত অংশে মেখে নিলে আর মশা কামড়াবে না। আর এই দ্বিতীয়টিতে হল কারবলিক অ্যাসিড, ঘরের আশেপাশে ছড়িয়ে দিলে সাপের উৎপাত থেকে নিশ্চিন্ত।' এই বলে বোতল দুটো পকেটে পুরে, টর্চটা মাথায় ঠেকিয়ে আমায় একটা সেলাম ঠুকে ভদ্রলোক বুট জুতো খটখটিয়ে হালদারবাড়ির দিকে চলে গেলেন।

রাত্রে ভালো ঘুম হল না।

ভোর হতে না হতে ভরদ্বাজকে বললাম আমার থার্মস ফ্লাস্কে দু'জনের মতো চা ভরে দিতে। চা এলে পর ফ্লাস্কটি নিয়ে আবার হালদারবাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

হালদার বাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছে দেখি চারিদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। অনাথবাবুর নাম ধরে ডাকব, না সটান দোতলায় যাব তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম—'ওমশাই, এই যে এদিকে।'

এবার দেখতে পেলাম অনাথবাবুকে প্রাসাদের পূর্বদিকের জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে হেঁটে আসছেন। তাঁকে দেখে মোটেই মনে হয় না যে রাত্রে তাঁর কোন ভয়াবহ বা অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আমার কাছে এসে হাসতে হাসতে হাতে একটা নিমের ডাল দেখিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না মশাই। আধ ঘণ্টা ধরে বনে বাদাড়ে ঘুরছি এই নিমডালের খোঁজে। আমার আবার দাঁতনের অভ্যেস কিনা।'

ফস করে রাত্রের কথাটা জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকল। বললাম, 'চা এনেছি। এখানেই খাবেন, না বাড়ি যাবেন?'

'চলুন না, ওই ফোয়ারার পাশটায় বসে যাওয়া যাক।'

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তিসূচক 'আঃ' শব্দ করে আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে অনাথবাবু বললেন, 'খুব কৌতূহল হচ্ছে না?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে, তা একটু—'

'বেশ। তবে বলছি শুনুন। গোড়াতেই বলে রাখি—এক্সপিডিশন হাইলি সাক্সেসফুল। আমার এখানে আসা সার্থক হয়েছে।' অনাথবাবু এক মগ চা শেষ করে দ্বিতীয় মগ ঢেলে তাঁর কথা শুরু করলেন।

'আপনি যখন আমায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন তখন পাঁচটা। আমি বাড়ির ভেতরে ঢোকবার আগে এই আশপাশটা একটু সার্ভে করে নিলুম। অনেক সময় ভূতের চেয়ে জ্যান্ত মানুষ বা জানোয়ার

থেকে উপদ্রবের আশঙ্কা বেশি থাকে। যাই হোক, দেখলুম কাছা-কাছির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু নেই।

'বাড়িতে ঢুকে একতলার ঘরগুলোর মধ্যে যেগুলো খোলা হয়েছে সেগুলোও একবার দেখে নিলুম। জিনিষপত্তর তো আর অ্যাদ্দিন ধরে বিশেষ পড়ে থাকার কথা নয়। একটা ঘরে কিছু আবর্জনা, আর আরেকটার কড়িকাঠে গুটি চারেক ঝুলন্ত বাদুড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। বাদুড়গুলো আমায় দেখেও নড়ল না। আমিও তাদের ডিসটার্ব করলুম না।

'সাড়ে ছ'টা নাগাদ দোতলার ওই আসল ঘরটাতে ঢুকে রাত কাটানোর আয়োজন শুরু করলুম। একটা ঝাড়ন এনেছিলুম, তাই দিয়ে প্রথমে আরামকেদারাটিকে ঝেড়ে পুঁছে সাফ করলুম। কদিনের ধুলো জমেছিল তাতে কে জানে?

'ঘরের মধ্যে একটা গুমোট ভাব ছিল, তাই জানালাটা খুলে দিলুম। ভূত বাবাজী যদি সশরীরে আসতে চান তাই বারান্দার দরজাটাও খোলা রাখলুম। তারপর টর্চ ও ফ্লাস্কটা মেঝেতে রেখে ওই বেতছেড়া আরামকেদারাতেই শুয়ে পড়লুম। অসোয়াস্তি হচ্ছিল বেশ, কিন্তু এর চেয়েও আরো অনেক বেয়াড়া অবস্থায় বহুবার রাত কাটিয়েছি, তাই কিছু মাইণ্ড করলুম না।

'আশ্বিন মাস, সাড়ে পাঁচটায় সূর্য ডুবেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা বেশ জমাট বেঁধে উঠল। আর সেই সঙ্গে সেই গন্ধটাও ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি এমনিতে খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, সহজে বড় একটা এক্‌সাইটেড হই না, কিন্তু কাল যেন ভেতরে ভেতরে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলুম।

'সময়টা ঠিক বলতে পারি না, তবে আন্দাজ মনে হয়, ন'টা কি সাড়ে ন'টা নাগাদ জানালা দিয়ে একটা জোনাকি ঘরে ঢুকেছিল। সেটা মিনিট খানেক ঘোরাঘুরি করে আবার জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেল।

'তারপর কখন যে শেয়াল, ঝিঁঝিঁর ডাক থেমে গেছে, আর কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়াল নেই।

'ঘুমটা ভাঙল একটা শব্দে। ঘড়ির শব্দ। ঢং-ঢং-ঢং করে বারোটা বাজল। মিঠে অথচ বেশ জোর আওয়াজ। জাত ঘড়ির আওয়াজ, আর সেটা আসছে বাইরের বারান্দা থেকে।

'কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমটা ছুটে গিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে আরো দুটো জিনিষ লক্ষ্য করলুম। এক—আমি আরামকেদারায় সত্যিই খুব আরামে শুয়ে আছি। ছেড়াটা তো নেইই, বরং উলটে আমার পিঠের তলায় কে যেন একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে গেছে। আর দুই—আমার মাথার উপর একটি চমৎকার ঝালব সমেত আস্ত নতুন টানা-পাখা, তা থেকে একটি নতুন দড়ি দেয়ালের ফুটো দিয়ে বারান্দায় চলে গেছে, এবং কে জানি সে দড়িতে টান দিয়ে পাখাটি আমায় চমৎকার বাতাস করছে।

'আমি অবাক হয়ে এই সব দেখছি আর উপভোগ করছি, এমন সময় খেয়াল হল অমাবস্যার রাত্তিরে কী করে জানি ঘরটা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারপর নাকে এল একটা চমৎকার গন্ধ। পাশ ফিরে দেখি কে জানি একটি আলবোলা রেখে গেছে, আর তাব থেকে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে একেবারে সেরা অম্বুরী তামাকের গন্ধ।'

অনাথবাবু একটু থামলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, 'বেশ মনোরম পরিবেশ নয় কি?'

আমি বললাম, 'শুনে তো ভালোই লাগছে। আপনার রাতটা তাহলে মোটামুটি আরামেই কেটেছে?'

আমার প্রশ্ন শুনে অনাথবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বললাম, 'তাহলে কি সত্যি আপনার কোন ভয়ের কারণ ঘটে নি? ভূত কি আপনি দেখেন নি?'

অনাথবাবু আবার আমার দিকে চাইলেন। এবার কিন্তু আর ঠোঁটের কোণে সে হাসিটা নেই। ধরা গলায় ভদ্রলোকের প্রশ্ন এল, ‘পরশু যখন আপনি ঘরটায় গেলেন, তখন কড়িকাঠের দিকটা ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন কি?’

আমি বললাম, ‘তেমন ভালো করে দেখি নি বোধহয়। কেন বলুন তো?’

অনাথবাবু বললেন, ‘ওখানে একটা বিশেষ ব্যাপার রয়েছে, সেটা না দেখলে বাকি ঘটনাটা বোঝাতে পারব না। চলুন।’

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনাথবাবু কেবল একটি কথা বললেন, ‘আমার আর ভূতের পেছনে ধাওয়া করতে হবে না সীতেশবাবু। কোনদিনও না। সে শখ মিটে গেছে।’

বারান্দা দিয়ে যাবার পথে ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম সেরকমই ভাঙা অবস্থা।

ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে অনাথবাবু বললেন, ‘চলুন’।

দরজাটা ভেজানো ছিল। আমি হাত দিয়ে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। তারপর দু’পা এগিয়ে মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আমার সমস্ত শরীরে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল।

বুটজুতো পরা ও কে পড়ে আছে মেঝেতে?

আর বারান্দার দিক থেকে কার অট্টহাসি হালদারবাড়ির আনাচে-কানাচে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার রক্ত জল করে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা সব লোপ পাইয়ে দিচ্ছে? তাহলে—?

আর কিছু মনে নেই আমার।

যখন জ্ঞান হল, দেখি ভরদ্বাজ আমার খাটের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমায় হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন ভবতোষ মজুমদার। আমার চোখ খুলতে দেখে ভবতোষবাবু বললেন, ‘ভাগ্যে সিধুচরণ আপনাকে দেখেছিল ও বাড়িতে ঢুকতে

নইলে যে কী দশা হত আপনার জানি না। ওখানে গেছলেন কোন্ আক্কেলে ?'

আমি বললাম, 'অনাথবাবু যে রাত্রে—'

ভবতোষবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আর অনাথবাবু! কাল যে অতগুলো কথা বললুম সে সব বোধহয় কিছুই বিশ্বাস করেন নি ভদ্রলোক। ভাগ্যে আপনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাত কাটাতে যান নি ও বাড়িতে। দেখলেন তো ওঁর অবস্থা। হলধরের যা হয়েছিল, এঁরও ঠিক তাই। মরে একেবারে কাঠ, আর চোখ ঠিক সেইভাবে চাওয়া, দৃষ্টি সেই কড়িকাঠের দিকে।'

আমি মনে মনে বললাম, মরে কাঠ নয়। মরে কী হয়েছেন অনাথবাবু তা আমি জানি। কালও সকালে গেলে দেখতে পাব তাঁকে—গায়ে কালো কোট, পায়ে বুট জুতো—হালদারবাড়ি পুব দিকের জঙ্গল থেকে নিমের দাঁতন হাতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন।

অমলা

বিমল কর

আমাদের বন্ধু নীলুর সঙ্গে বেড়াতে গেলেই কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। ঘাটশিলায় গিয়ে মিহির হাত ভেঙেছিল; যশিডিতে যেবারে গেলাম, সেবারে শরৎ টাঙ্গা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় বেশ চোট পেয়েছিল। আর একবার তো আমরা রাঁচির রাস্তায় বাস উল্টে মরে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছি। অবশ্য এসব ঘটনার জন্য নীলুকে পুরোপুরি দায়ী করা উচিত নয়। তার এইমাত্র অপরাধ, সে ঘাটশিলার স্বর্ণরেখার পেছল পাথরে পা দিয়ে এগিয়ে যাবার পথটা আমাদের দেখিয়েছিল। কিংবা যশিডিতে যে টাঙ্গাটা চাকা ভেঙে রাস্তার মধ্যে কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে সে টাঙ্গাটা নীলুই ভাড়া করেছিল। রাঁচির বাস সম্পর্কেও একই কথা, নীলুই আমাদের সন্ধ্যের বাস ধরার জন্য টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এই সব ঘটনাকে আমরা নীলুর সঙ্গে একটা যোগসূত্রে জড়িয়ে দিলেও সেটা নিতান্তই পরিহাস। যে ঘটনা স্বাভাবিক দুর্ঘটনা হিসেবে ঘটতে পারত, তার সঙ্গে নীলুকে জড়ানো অনুচিত। তবু আমরা ঠাট্টা করেই বলতাম, নীলু একটা অপয়া। নীলু এসব কথায় কান করত না, রাগও করত না।

সেবার ঘটনাটা অন্যরকম ঘটেছিল, এর জন্যে নীলু কতটা দায়ী বা কতটা দায়ী নয়, তাও আমি জানি না। কিন্তু যা ঘটেছিল, তার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নীলুর ভূমিকাই ছিল মুখ্য।

ক্রিসমাসের দিন চার-পাঁচ ছুটির মুখে নীলু এসে বলল, 'চল কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসি।' মিহির আর শরৎ ভাবছিল, শীতের দিনে হরিহরদের গালুডি থেকে বেড়িয়ে আসবে।

শরৎ বলল, 'কাছাকাছি জায়গাটা কোথায়?' নীলু বলল, 'ভেরি নিয়ার। সীতারামপুর থেকে মাত্র কয়েকটা স্টেশন।' আমি বললাম, 'সেখানে কী আছে?' নীলু বলল, 'সাঙ্ঘাতিক লোনলি; এন্তার ফাঁকা মাঠ, শীতের ঠাণ্ডায়, হিমে জমে বরফ হয়ে থাকে। ফার্স্ট ক্লাস মুর্গী···আর শুনেছি, টেরিফিক চমচম পাওয়া যায়।' শরৎ ফাঁকা মাঠের ভক্ত, কাব্যে তার মতি আছে। মিহির মুর্গী রাঁধে চমৎকার। কিন্তু এসব কথা নয়, দু-চারদিনের জন্যে শীতের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে আসায়, আমরা সকলেই উৎসাহী ছিলাম। অতএব যথাসময়ে যাত্রা করা গেল।

রেলের টাইমটেবলে এই স্টেশনের নামটি আছে কিনা আমি জানি না। হয়তো আছে, কিন্তু তার নাম আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমরা ট্রেন থেকে নেমেছিলুম সন্ধ্যের পর ফাঁকা। স্টেশনে দু-একটা বাতি টিম টিম করে জ্বললেও হালকা জ্যোৎস্না এবং ঘন কুয়াশার মধ্যে স্টেশনের সাইনবোর্ড আমাদের চোখে পড়েনি। জায়গাটি আশ্চর্য রকম নিরিবিলি, মনে হয় যেন জগৎ-সংসারের স্থূল স্পর্শ থেকে এক প্রান্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। ছায়ার মত একটি দুটি রেল কোয়ার্টার, টিলার মতন উঁচু জায়গায় ছোট স্টেশন ঘর, বাইরে দু-চারটে খাপরা ছাওয়া দোকান, টিমটিমে লণ্ঠনের আলো। গাড়ি-ঘোড়ার কোনও চিহ্ন কোথাও ছিল না। নিজেদের বিছানা সুটকেশ নিজেরাই বয়ে বয়ে প্রায় সিকি মাইলটাক পথ এগিয়ে আমরা যে বাড়িটায় ঢুকলাম, সে বাড়িতে মানুষ ছিল। মোটামুটি আমাদের পক্ষে চলনসই বাড়ি। মাথার ওপর টালি, মাঝারি মাপের একখানি ঘর, সামনে বারান্দা, অল্প উঠোন, বাড়ির বাইরে কুয়াতলা। যে মানুষটি আমাদের অভ্যর্থনা করল তার বয়স হয়েছে, এ বাড়িরই রক্ষক, অর্থাৎ মালি বলা যায়। বাড়ির ব্যবস্থা নীলুই করেছিল আগে।

নীলু জনতা স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। ঘরটা

মোটামুটি পরিষ্কারই ছিল, গোটা দুই পুরোনো তক্তাপোশ জুড়ে আমাদের বিছানা পাতা হয়ে গেল। মোম আর লণ্ঠনের আলোয় হাতমুখ ধুয়ে আমরা যখন কম্বল পায়ে চাপিয়ে বসলাম তখন মোটামুটি আরামই লাগছিল। চা আর সিগারেট খেতে খেতে শরৎ বললে, 'রিয়েলি ইট ইজ উইন্টার।' মিহির বলল, 'মস্ত ভুল হয়ে গেল, একটা হুইস্কি আনা উচিত ছিল।' আমি বললাম, 'কম্বলে শীত কাটলে হয়।' নীলু চায়েব পর টিফিন কেরিয়ারে বয়ে আনা খাবারগুলো একে একে গরম করে নিল। তারপরে গল্পগুজবে আরও খানিকটা রাত হলে আমবা খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম। বাইরের বারান্দায় বালতি ভরা জল ছিল, মুখ ধুতে গিয়ে মিহির যখন কুলকুচো করছে আর শবৎ তার হাতে টর্চের আলোটা এপাশ ওপাশ দোলাচ্ছে, তখনই হঠাৎ তার নজরে পড়ল বারান্দাব এক কোণে একটা টিনের সাইনবোর্ড। টর্চের আলোটা সাইনবোর্ডে পড়তেই শরৎ তার হাত আর নাড়তে পারল না। একই ভাবে আলো ফেলে রেখে হঠাৎ সে বলল, 'আরে!'

তার 'আরো, বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভাল করে তাকালাম, তাকিয়ে দেখি সাইনবোর্ডে একটি মেয়ের মুখ। স্পষ্ট করে তার চোখ মুখ দেখা যাচ্ছিল না। না দেখা যাবার কারণ রঙের বিবর্ণতা ততটা নয় যতটা মেয়েটির মুখের ভঙ্গির জন্যে। মুখটা একপাশে হেলানো, একটিমাত্র চোখ নাক এবং এলানো চুলের গুচ্ছ চোখে পড়ছিল। একপাশে বড় বড় করে লেখা 'অমলা স্টোর্স'। সাইনবোর্ডটা দেখতে দেখতে আমি বললাম, 'আশ্চর্য!'

নীলু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, মিহিরের মুখ ধোওয়াও শেস। মিহির বলল, 'কী আশ্চর্য?' আমি বললাম, 'ওদিকে দেখ।'

মিহির সাইনবোর্ডটার দিকে তাকাল, শরৎ তখনও সামনে টর্চের আলো সেদিকপানে ধরে রেখেছে। মিহির কেমন যেন চমকে উঠে বলল, 'মাই গড!'

নীলু আমাদের ঘাড়ের পাশে এসে গিয়েছিল, বলল, 'কী রে ?' বলে সে নিজেই সাইনবোর্ডটার দিকে তাকাল। তাকিয়ে আছে তো আছেই। আচমকা সে বলল, 'স্ট্রেঞ্জ !'

এই যে আমরা চার বন্ধু অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ড আঁকা অধ বিবর্ণ মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে যে যার মত অবাক আর বিহ্বল হয়ে গেলাম, তার নিশ্চয় কোনও কারণ ছিল। কিন্তু কারণটা কী তখন বোধ হয় কেউই স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারছিলাম না। কেন যেন আমরা খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে মুখ ধুয়ে নিলাম।

মিহির বলল, 'সেই বুড়োটা কোথায় গেল ?'

নীলু বলল, 'ওর বাড়িতে গিয়েছে। কাছেই বাড়ি।'

আমরা হাত-মুখ মুছতে মুছতে ঘরে চলে এলাম। শরৎ দরজা বন্ধ করে দিল।

মিহির বিছানার ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে দিল। আমরা চার বন্ধু পর পর সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

সিগারেটে মস্ত টান দিয়ে শরৎ শেষে বলল, 'এখানে ওই সাইন বোর্ড কি করে এল ?'

নীলু বলল, 'মানে ? নিশ্চয় কেউ এনে রেখেছে।'

শরৎ বলল, 'এরকম ঘটনা আমি জীবনে দেখি নি। অবাক কাণ্ড মাইরি।'

মিহির বলল, 'আমি থ মেরে গিয়েছি।'

আমি বলাম, 'কি করে এমন হয়, আমার মাথায় ঢুকছে না।'

নীলু মুঠো পাকিয়ে সিগারেট টানছিল, ছাদের দিকে মাথা তুলে বিড়বিড় করে বলল, 'এ শালা ভূতের কারবার।'

আমরা চারজনেই অবাক হয়ে গিয়েছি অমলা স্টোর্সের বিজ্ঞাপনের মেয়েটিকে দেখে, কিন্তু কেন হয়েছি তা আরও কিছুক্ষণ কেউ প্রকাশ করতে পারলাম না।

তক্তাপোষের ওপর ঢালাও জোড়া বিছানায় চার বন্ধু চুপচাপ বসে প্রথম সিগারেট শেষ করে ফেললাম। ঘরের মধ্যে এক কোণে লণ্ঠনটা জ্বলছে মিটমিট করে। ঘরের মধ্যেই শীত এত প্রবল যে বাইরে বোধ হয় পশু-পাখিও নেই। কোথাও কোন শব্দ আমরা শুনছিলাম না। একটা কুকুর পর্যন্ত কোথাও ডাকছে না।

শরৎ তার কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সাধবাবার মতন করে বসল। বলল, 'ভাই, ওই যে বাইরে অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ডে মেয়েটার মুখ দেখলাম, ওই মুখ আমি আগে দেখেছি। এগজ্যাক্টলি স্যাট ফেস।'

মিহির বলল, 'আরে, ওই মেয়ের মুখ আমারও চেনা।'

আমি আর নীলুও একই কথা বললাম।

আমরা চার বন্ধু একই মেয়েকে চিনি এটা কিছু অসম্ভব নয়। এরকম পাঁচ সাত জনের নাম করে দেওয়া যায়, যেমন কলেজে নীলিমাকে, যদিও নীলিমা আমার আর শরতের সঙ্গে পড়লেও মিহিরদের সাথে পড়ত না। মিহির আর নীলু আলাদা কলেজে পড়ত। আমাদের কলেজে আড্ডা মারতে এসে নীলিমাকে দেখেছে। ইউনিভার্সিটিতে হাসির বেলায়ও সেই রকম। সে মিহিরদের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে ছিল, কিন্তু আমরা তাকে দেখেছি। নিরুপমা বৌদি, মিহিরদের পাড়ার সেই স্কুল-টিচার আভা মৈত্র— এইরকম কত মেয়ে আছে যারা আমাদের পরিচিত। কিন্তু সে পরিচয় সমষ্টিগতভাবে, একক নয়। অমলা স্টোর্সের মেয়েটির বেলায় আমাদের তেমন কোন ঘটনা মনে পড়ছিল না। মেয়েটিকে আমরা যেন চিনি—কিন্তু একা একা, কোন দিন একসঙ্গে দুজনেও তাকে দেখি নি।

নীলু শরৎকে বলল, 'তুই ওকে কোথায় দেখেছিস ?'

শরৎ বলল, ভাই, আমি চুঁচড়োয় একটা বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম ; বেশিদিনের কথা নয়, গত বর্ষায়, বোধ হয় শ্রাবণ

মাসে। আমার মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে বরযাত্রী। সেখানে প্রথম মেয়েটিকে দেখি। কন্যাপক্ষের মেয়ে, মানে পাত্রীর দিদি-টিদি হবে। সত্যি বলতে কি, বিয়েবাড়িতে যত মেয়ে ছিল তার মধ্যে ওই মেয়েটি নজর টানে সবার আগে। কেন নজর টানে সেকথা আমায় জিজ্ঞেস করো না। আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না। ওর অসম্ভব একটা চার্ম ছিল! লম্বা, শ্যামলা, ছিপছিপে চেহারা, শ্যামলা রঙ যে অত সুন্দর দেখায় আমি জীবনে দেখি নি। শরীরের গড়ন নিখুঁত, যেন চোখ-মুখ, তেমনি হাত-পা। স্পেশ্যালি চোখ, লোকে বলে পাখির পালকের মতন টানা চোখ নাকি হয়, আমি সেই প্রথম দেখলাম, সত্যিই পাখির পালকের মতন চোখ, মণিদুটো কালো কুচকুচ করছে, দাঁত কী অদ্ভুত সাদা আর ঝকঝকে। একটাই শুধু অবাক কাণ্ড, বিয়েবাড়িতে মেয়েটি তার মাথার চুল একেবারেই এলো রেখেছিল, খোঁপা নয়, বিনুনি নয়, একটা রিবন পর্যন্ত তার মাথায় ছিল না। এমন চমৎকার চুল মেয়েদের দেখাও যায় না আজকাল। যেমন ঘন, তেমনি কালো, সামান্য কোঁকড়ানো, আর কম করেও কোমর ছাড়ানো চুল। আমাদেব ধারণা হয়েছিল, মেয়েটি তার মাথার চুল দেখাবার জন্যে ওইভাবে রয়েছে। বিয়েবাড়িতে মেয়েরা অন্য পাঁচ ভাবে মাথার চুল দেখায়, কিন্তু এভাবে নয়। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলিও কবেছি। মেয়েদের বাড়ির তরফেও কেউ কেউ দেখলাম, একই কারণে অখুশি। কিন্তু আমাদের খুঁতখুঁতুনিতে কি আসে যায়। মেয়েটির চুলও তার চার্ম! বলতে নেই, আমি এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে বিয়ে-ফিয়ে ভুলে সারাক্ষণ ওকে দেখেছি, যতক্ষণ পেরেছি। আলাপের চেষ্টা করে একটা সুযোগও জুটেছিল। দু-চারটে কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছি, মেয়েটি শুধু হেসেছে। আমি শালা, টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি, প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে এমন করে নাড়া দিয়েছিল মেয়েটি কি

বলব।···পরের দিন আবার কলকাতা থেকে ছুটলাম, নিজে যেচেই বলতে পারিস, বর-বউ আনতে চুঁচড়োয়। গিয়ে দেখি—মেয়েটি নেই, ভোরবেলায় তার বাড়ি ফিরে গেছে। মন-টন খারাপ হয়ে গেল, যাঃ শালা, যেজন্যে যাওয়া সেটাই বরবাদ! তারপর আমি মেয়েটি সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেছি। শুনেছি ওরা বর্ধমানের লোক। এর বেশি কোন খবর পাই নি। আমার ভাই এবং ভাইয়ের বউ আমায় আর কিছু বলতে পারে নি বা বলে নি। আজ এতদিন পরে একেবারে অবিকল সেই মেয়েটির মুখ আমি ওই ছবির মধ্যে দেখলাম। হয়তো চোখের ভুল। কাল সকালে একবার দেখব। তবে, আমি ও মুখ ভুলে যাব এমন আমার মনে হয় না। এখানে কি করে, কার হাতে ওই মুখের ছবি ফুটে উঠল বুঝতে পারছি না। দোকানের সাইনবোর্ডে অমন সুন্দর মেয়ের মুখ কেউ আঁকে নাকি? ছি ছি!'

শরৎ যখন কথা বলছিল, মিহির খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন কিছু প্রতিবাদ করে বলতে চায়। শরৎ তার কথা শেষ করা মাত্র মিহির ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'তা কি করে হবে? আমি যে ওকে নিজের চোখে চোর বাগানে দেখেছি!'

'চোর বাগানে?' আমি শুধোলাম।

'আলবাৎ চোর বাগানে। চোর বাগানে আমার মেজদিরা থাকে। মানে মেজদির শ্বশুরবাড়ি চোর বাগানে। ভাই—সে এক কাহিনী। আমার মেজদির এক ভাশুর বরাবরই পাগলা গোছের, মাথায় ছিট-টিট আছে। কিন্তু খুব পণ্ডিত লোক। এনশেণ্ট হিস্ট্রীর নামকরা ছাত্র ছিলেন এককালে, কলেজে পড়িয়েছেনও কিছুকাল। ক্ষ্যাপা টাইপের লোক, চাকরি-বাকরি ছেড়েও দিয়েছিলেন। বিয়ে-থা করেন নি। আমরা তাঁকে বিলাসদা বলেই ডাকতাম। নাম ছিল বিলাস। একদিন এক কাণ্ড হল। আমাদের বাড়িতে খবর

এল বিলাসদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিলাসদা বাচ্চা নন, ছেলে মানুষ নন, পলিটিক্যাল পার্টির লোক নন যে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাবা বললে, একবার মেজদির বাড়ি যা, গিয়ে দেখ কি ব্যাপার। মেজদির চোর বাগানের বাড়িতে গিয়ে দেখি, একটা হুলুস্থুল কাণ্ড চলছে। বিলাসদা দিন দুয়েক আগে দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ওরকম তো রোজ যান—কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে নি। রাত পর্যন্ত বিলাসদা ফিরছেন না দেখে বাড়ির লোক বেশ চিন্তিত হয়ে ওঠে। খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে। ক্ষ্যাপা লোক, কোথায় গেছেন কি করছেন বোঝা মুশকিল। সে-রাতটা কাটার পর সকাল থেকে ছুটোছুটি লেগে গেল। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি, বন্ধু-বান্ধবের ডেরা-ডাণ্ডা, হাসপাতাল, পুলিশ--কোথাও কোন ট্রেস্ নেই। লোকটা তবে গেল কোথায়? কলকাতা ছেড়ে বিলাসদা পালিয়ে গেলেন নাকি? কোথায় গেলেন? এই রকম একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থায় আমি মেজদির বাড়ি গিয়ে-ছিলাম সকালে। যাওয়াই সার, কোন কাজে এলাম না। মেজদি বলল, তুই বিকেলে একবার আসিস। আবার বিকালে গেলাম, গিয়ে দেখি বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছে। বিলাসদাব বাস্তাব মধ্যে সেরিব্যাল অ্যাটাক হয়। রাস্তাতেই পড়ে যান। তাঁকে হাস-পাতালে নিয়ে যাবার পর, এমারজেন্সির বাইরে ফেলে রাখা হয়েছিল। পরে বেডে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো একটা দিন কমপ্লিট অজ্ঞান ছিলেন, তারপর মারা যান। বিলাসদার কাছে এমন কিছু ছিল না—তাঁকে ট্রেস করা যায়। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ট্রেস করা গেল যখন, তখন শুনলাম মর্গ থেকে ডেডবডি আনিতে হবে। সেই বডি আনতে লোক গেছে।···বুঝতেই পারো, আমি কি অবস্থায় পড়েছি তখন। বিলাসদা মারা যাবার খবর পেয়ে বাড়িতে অনেক লোক এসে গেছে, আসছে একে একে, তার মধ্যে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও বিলাসদার পুরোন ছাত্রছাত্রীরাও ছিল। কান্নাকাটি,

কেউ খাট আনছে, কারা যেন ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল কিনে আনল। ঠিক ওই সময় আমি একটি মেয়েকে দেখলাম। মেয়ে দেখার অভ্যাস আমার চিরকালের। কিন্তু ভাই, সত্যি বলছি, এরকম মেয়ে আমি জীবনে দেখি নি। আশ্চর্য দেখতে, তার পুরো চেহারার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ ছিল, যা বুঝিয়ে বলা যায় না। ছিপছিপে চেহারা মাথায় লম্বা, সুন্দর কোমর, ঘাড়-পিঠ নিখুঁত। মুখখানিও ভারি মিষ্টি, মোলায়েম, অথচ অভিজাত। সাদা খোলের একটা শাড়ি, কালো পাড়, গায়ের জামাও সাদা। মাথার চুল একেবারে এলো। বিষণ্ণ, শান্ত, উদার চোখ মেলে সে বারকয়েক বারান্দা আর বাইরে এল গেল। আমি যতক্ষণ পারি তাকে দেখতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল ও যেন চোখের আড়ালে না যায়। বাড়িতে এত লোকজন যে কে কার আত্মীয়, কার কি পরিচয়, ওই দুঃখের অবস্থায় কাউকে জিজ্ঞেস করার কথা নয়। তবু আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল, জানি না। আমি গিয়েছি বিলাসদার শ্মশানযাত্রায় শোকযাত্রী হতে, অথচ একটি মেয়েকে দেখে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে তাকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। বিলাসদার দেহ এল। বাড়িতে নামানো হল। কান্নাকাটি, ফুল, অগুরু—কত কি হল—আমি শুধু মেয়েটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর দেখছি। তারপর যখন বিলাসদাকে নিয়ে আমরা বেরোচ্ছি সন্ধেবেলা, হরিবোল শুরু হয়েছে, মুখ ফিরিয়ে দেখি—সেই মেয়েটি। নিবিড়, বিষণ্ণ, উদাস চোখে চেয়ে আছে। শোক আর বেদনায় সেই সন্ধ্যাটি যেন তার মুখশ্রীতে নিবিড় হয়ে থাকল।···তারপর আর তাকে দেখি নি। এতকাল পরে আজ এখানে আবার তার ছবি দেখলাম। আমি জানি না, আমার কোন ভুল হচ্ছে কিনা—তবে সেই মেয়েটিকে আমার ভোলার কথা নয়। অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ডের ছবিটা আর ওই মেয়ের মুখ হুবহু এক।··· আমি বুঝতে পারছি না, কেমন করে এটা হল? তাছাড়া ওই মুখ অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ডেই বা এল কি করে? কে আঁকল? বলতে

বলতে মিহির চুপ করে গেল।

মিহিরের কথা ফুরোলে আমরা চুপচাপ। নীলু নতুন একটা সিগারেটের প্যাকেট খুলল। আমরা চারজনে সিগারেট ধরালাম। শীত যেন হাত-পা গায়ে বসে যাচ্ছে। কপাল ব্যথা করছিল।

আমি বললাম, 'অমলা স্টোর্সের ওই মেয়েটির মুখ দেখে আমার একজনের কথা মনে পড়ছে। তার নাম অমলা কিংবা কমলাও হতে পারে—ঠিক বলতে পারব না। পারব না, কেন না তাকে যারা ডাকছিল, তারা আমার থেকে এতটা তফাতে ছিল যে আমি নামটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম না। ব্যাপারটা আগে ঘটে নি। এবার পূজোর সময় মা আর মাসিমা তীর্থ করতে, বা বলো বেড়াতে, ওই স্পেশাল গাড়িতে যাচ্ছিল। টাকা-পয়সা জমা দিয়ে যথারীতি সিট বুক হয়েছে। যাত্রার দিন আমি গেছি হাওড়া স্টেশনে মা আর মাসিমাকে তুলে দিতে। সে ভাই এক এলাহি কাণ্ড। মানুষে এত বেড়ায় আমার জানা ছিল না। বুড়ো-বুড়ি, বউ, বিধবা, যুবতী কোনদিকেই কমতি নেই। যারা যাবে—তারা তো যাবেই—যারা যাচ্ছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনে প্লাটফর্মটা গিজগিজ করছে। মা আর মাসিমাকে তুলে দিয়ে আমি নিচে নেমে একটু হাওয়া খাচ্ছি, দেখি ওই মেয়ে। সংসারে এক একটা ঘটনা ঘটে ঠিক যেন বজ্রপাত, কখন ঘটে গেল, কি করে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, স্তম্ভিত হলাম—বোঝাই যায় না। এটাও ঠিক তেমনি। একেবারে আচমকা দেখলাম সেই মেয়েটি আর দুজনের সঙ্গে বিছানাপত্র, সুটকেশ এনে গাড়িতে চড়ছে। অসামান্য চেহারা ভাই। যাকে আমরা ডানা-কাটা পরী, উর্বশী বা ওই রকম কিছু বলি, মোটেও তা নয়। একেবারে অন্য রকম, দেখামাত্র চোখে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক লেগে যায়। এমন সুশ্রী, সংযত, শালীন চেহারা। ভগবান মেয়েটিকে কোথাও যেন চড়া রঙে আঁকতে চাননি, একেবারে নরম তুলিতে নরম রঙে। নিখুঁত গড়ন, কোথাও কোন অমিল নেই, অসঙ্গতি নেই

যেমন হাত-পা, তেমনি কোমর, বুক, গলা। মুখটি যেন শরতে ফুটে ওঠা জ্যোৎস্নার মতন, এমন মসৃণ, স্নিগ্ধ, চোখ জুড়ানো। আমি হাঁ করে মেয়েটিকে দেখতে লাগলাম। সে গাড়িতে উঠল, তার জায়গা খুঁজে নিল, জিনিসপত্র রাখল, তার দুই সঙ্গিনী তাকে অমলা কিংবা কমলা বলে ডেকে ডেকে কথা বলতে লাগল। আর হু-হু করে সময় বয়ে যেতে লাগল। আমি তখন চোখে কি দেখছি আর দেখছি না খেয়াল নেই, বুকের মধ্যে কিসের একটা তোলপাড় চলছে, মাথা ঝিমঝিম করছিল। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটির চুল ছিল এলানো। কেন, কি জন্যে আমি জানি না। এই চুলের জন্যে তাকে কেমন একটা যোগিনী যোগিনী দেখাচ্ছিল, সাম সর্ট অফ রিলিজিয়াস পিউরিটি ওয়াজ দেয়ার।···তারপর গাড়িটা কখন ছেড়ে দিল। দেখলাম, সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাসছে, আস্তে আস্তে হাত নাড়ল। আমিও একবার হাত নেড়ে দিলাম। গাড়ি ওকে নিয়ে চলে গেল। আমি বেহুঁশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।···সত্যি ভাই কোনদিন ভাবি নি—আর ওকে দেখব। কিন্তু আজ হল কী? এই একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায়—একটা বাড়িতে কোথাকার একটা দোকানের সাইনবোর্ডে তারই মুখ দেখলাম। আশ্চর্য! আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। তবু অবিশ্বাস করতে পারছি না।' আমি আমার কথা শেষ করলাম।

এবার নীলুর পালা। আমরা চারজনেই মাথা গায়ে কম্বল জড়িয়ে আছি। কনকন করছে ঠাণ্ডা। বিছানাটা এলোমেলো হয়ে গেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভরা। লণ্ঠনের আলোটাকে কুয়াশার আড়াল দেওয়া আলোর মতন দেখাচ্ছে।

নীলু বলল, 'আমি ভাই মেয়েটিকে দেখেছি একেবারে অন্যভাবে। একদিন দুপুরবেলায় অফিসে আমার এক বন্ধুর ফোন পেলাম। বলল, শিগগির আয়, আমার খুব বিপদ। ফোন পেয়ে ভবানীপুর ছুটলাম। গিয়ে দেখি পুষ্প—আমার বন্ধুর নাম পুষ্প—পাগলের মতন মাথা

খুঁড়ছে। লোকজন জমে গেছে চারপাশে। পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স। পুষ্পর বউ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ব্যাপারটা বুঝে দেখো, কোথা থেকে কী! সুইসাইড কেস, কাজেই পুষ্পর বউকে পোস্টমর্টেমের জন্যে নিয়ে চলে গেল, আর পুলিশরা পড়ল পুষ্পকে নিয়ে।...পরের দিন বিকেলে আমরা পুষ্পর স্ত্রীর ডেডবডি পেলাম। হিন্দু মহাসভার গাড়ি করে নিয়ে গেলাম কেওড়াতলা। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আমাদের পর আরেকটা ডেডবডি এল। খাটে শোওয়ানো, মুখ খোলা, ফুল-টুল সামান্য রয়েছে। কি বলব ভাই, এমন মেয়ে আমি দেখি নি। মনেই হয় না—সে মারা গেছে। যেন চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মজার কোন স্বপ্ন দেখছে। ঠিক ফুলের মতন মুখ, কি অপরূপ চোখ, ঠোঁট, নাক। মাথার চুলগুলো কাঁধের দুপাশে ছড়ানো। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম। ভুল করে জ্যান্ত লোককে পোড়াতে আনে নি তো? কিন্তু তাই কি হয়? পুষ্পর বউকে ততক্ষণে চুল্লিতে নিয়ে যাচ্ছে, পুষ্প হাউমাউ করে কাঁদছিল।...আমি শুধু মেয়েটিকে দেখছি। দেখছি আর ভাবছি, ও কি সত্যিই মৃত না জীবিত? জীবিত না মৃত? ভাবতে ভাবতে দেখি, মেয়েটি যেন তার ঠোঁটের কোণে পাতলা একটু হাসল। কেন হাসল, বুঝতে পারার আগেই চুল্লিতে তার ডাক পড়ল। হাঁ—আমি তো তাই বলব, চুল্লিতে তার ডাক পড়ল।...অমন একটা মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার আগে আমি শ্মশান ছেড়ে পালিয়ে এলাম।...জীবনে আমরা কত মুখ ভুলে যাই, কোন কোন মুখ আমৃত্যু ভুলি না। এই মুখ হল সেই মুখ, আমি ভুলি নি, ভুলতে পারি নি।...কিন্তু অবাক হয়ে ভাবছি, সেই মুখ এখানে এল কি করে? স্ট্রেঞ্জ!' নীলু চুপ করল।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, বিয়েবাড়িতে যে মুখের দেখা শরৎ পেয়েছিল, সেই মুখ কোথা দিয়ে কোথায় এসে শেষ হল। হায়, হায়।

আমরা বসেই থাকলাম, চুপচাপ, চার বন্ধু, মাথা গা কম্বলে জড়িয়ে, লণ্ঠনটা টিমটিম করে জ্বলতে লাগল।

হঠাৎ শরৎ বলল, 'বাইরে বড় শীত, আমার কেন যেন ইচ্ছে করছে—অমলাকে ঘরে এনে রাখি।'

'মানে, ওই অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ডটাকে?'

শরৎ মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। তবে সাইনবোর্ড-ফোর্ড বলো না। ও অমলা।'

নীলু বলল, 'আনলেই হয়। এমন কি কঠিন কাজ?'

আমরা চার বন্ধু টর্চ আর লণ্ঠন নিয়ে দরজা খুলে অমলাকে আনতে গেলাম বারান্দায়।

সমস্ত চরাচর জুড়ে জ্যোৎস্না নেমেছে, কী গভীর কুয়াশা, হিম ঝরছে নিঃশব্দ বৃষ্টির মতন।

শরৎ টর্চ ফেলল। ফেলেই বলল, 'আরে!'

আমরা বারান্দার শেষপ্রান্তের দিকে তাকালাম!

অমলা স্টোর্সের সাইনবোর্ডটা কোথাও নেই।

ওজন মাত্র একুশ গ্রাম

অদ্রীশ বর্ধন

কাঁটায় কাঁটায় রাত ঠিক আড়াইটের সময়ে ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে তাকিয়ে যাকে দেখলাম, ঠিক তিন মাস আগে রাত আড়াইটের সময়ে তার প্রাণবায়ু মিলিয়েছে শূন্যে।

বললাম—বুড়ি, তোমাকে না বলেছিলাম মারা যাওয়ার পর ভয় দেখাবে না?

হাসল সে। যেন কালো মসলিনে গড়া সূক্ষ্ম শরীরীর গালেও টোল দেখলাম অতি স্পষ্ট। বলল—আমি তো ভয় দেখাচ্ছি না।

ভয় পাইনি বলে। যদি পেতাম?

কেন পাবে? আমি তোমায় কী বলতাম, মনে করে দেখো। বলতাম মরে গিয়ে ঐ পার্টিসনের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকব। লালপেড়ে শাড়ি পরব। লাল সিন্দুরের টিপ পরবো। হু-উ-উ-উ করে এমন ভয় দেখাবো যে তোমার দাঁতকপাটি লেগে যাবে। তাই কি করেছি? আয়ত চোখ দুটিতে দুষ্টুমি বিছিয়ে বলল বুড়ি, মানে, আমার মৃতা স্ত্রী।

আমি শুয়ে শুয়ে বললাম তা অবশ্য করোনি। করলে তোমার ছেলেই কষ্ট পেতো।

কেন?

আচমকা ভয় দেখালে অক্কা পেতাম। আর আমি অক্কা পেলে তোমার ছেলের কি হাল হবে কল্পনা করে নিও।

চুপ করে রইল স্ত্রী। নাইট ল্যাম্পের মৃদু আলোয় দেখলাম ওর রূপ যেন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বিয়ের রাতে বাসরঘরে যে রূপ দেখেছিলাম, এ-যেন সেই রূপ। সেই রকম আবেশ জড়িত আয়ত

চোখ, লাবণ্যস্নিগ্ধ ঢলঢল মুখশ্রী, হৃদয় জোড়া সুখ উথলে ওঠা অজন্তা ঠোঁটের চারু ভঙ্গিমা। বার বার দেখেও আশা মেটে না।

কি দেখছো অমন করে? ঝকঝকে চোখে শুধোলো সে।

তোমাকে।

ওঃ, সোহাগ দেখে আর বাঁচি না। রাত তুপুরে বৌকে দেখা হচ্ছে।

বৌকে তো রাত তুপুরেই দেখে। কনুইয়ের ওপর দেহের ভর রেখে বললাম।

সে-বৌ তো এ-বউ নয়। আমি এখন মরে গেছি।

আমার মনের মধ্যে বেঁচে উঠছো।

থাক থাক, যখন চোখের সামনে বেঁচেছিলাম, তখন তো এমন করে কোন দিন কথা বলোনি। তখন তো ফাঁক পেলেই লিখতে বসতে। বৌয়ের সঙ্গে তু-দণ্ড কথা বলার ফুরসৎ হত না।

কথাই কি সব বুড়ি? মনটাকে আমর দেখোনি?

চুপ করে রইল সে। শান্ত চোখে চেয়ে রইল ছেলের পানে। পাশেই ছোট মশারীর মধ্যে আমার-সোনা-চাঁদের-কণা তখন বিচিত্র ভঙ্গিমায় উপুড় হয়ে ঘুমে অচেতন। বলল—দেখেছিলাম বলেই তো এখনও রোজ আসি গো। আমি কি জানি না আমাকে তুমি কত ভালোবাসো?

লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম—যদি জানতাম তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে তাহলে কি আর লিখে সময় নষ্ট করতাম বুড়ি? শুধু গল্প করতাম। তোমার কোন ক্ষোভ রাখতাম না।

চোখ তুলে চাইল সে। সটান তাকালো আমার দিকে। আমি ওর সূক্ষ্ম ছায়াশরীরের ভেতর দিয়ে ঘরের দেওয়াল দেখতে পেলাম।

ও বলল—দেখো এ-সংসারে যা ঘটেছে, তার প্রত্যেকটির একটা অর্থ আছে, প্রতিটি ঘটনা মানুষকে সাহায্য করছে তাকে এগিয়ে [illegible]তে।

বুঝলাম না। কি বলতে চাও ?

বলতে চাই যে ভাগ্যবানেব বউ মরে, অভাগার ঘোড়া।

আহত কণ্ঠে বললাম—বুড়ি, বউ কি আমার আপদ ছিল যে, বউয়ের মৃত্যুতে আমি ভাগ্যবান হব ?

সেন্টিমেণ্ট বাদ দিলে একরকম তাই বলতে পারো, শান্ত সুন্দর চোখে চেয়ে থেকে বলল আমার বউ—আমাব ক্যানসার সারত না। এক আধ বছর বাঁচলেও সে বাঁচা সুখের হত না। না তোমার, না আমার, না ছেলের। বলো ঠিক কি না ?

চুপ করে রইলাম আমি।

ও বলল—মন খারাপ কর না। আমি তোমাকে প্রায় কি বলতাম মনে আছে ? তুমি বড় হবে। অনেক বড় হবে।

সেটা তুমি থাকলেই হত।

আমি গিয়েই তা বেশী করে হবে। তুমি এখন স্বাধীন। সারারাত মুমূর্ষ বউকে নিয়ে আব তোমাকে ছটফট করতে হবে না। ওষুধের জন্যে ছুটোছুটি করতে হবে না। ডাক্তার ডাকতে হবে না। বলো, তোমার ভাল হল না ?

বুড়ি !

সেন্টিমেণ্ট বাদ দাও। আমি তোমার জীবনের প্রতিবন্ধক হয়ে ছিলাম। সরে এলাম তোমার ভালোর জন্যেই।

সরেই যদি যাবে তো এসেছিল কেন ? কেন মাত্র দু'বছরের জন্যে তোলপাড় করে গেলে আমার নিঃসঙ্গ মালঞ্চ ? কেন ? কেন ? ক্যাম্প খাটে রাত্রিযাপন করতাম একা-একা, সে তো স্বর্গ ছিল আজকের এই সব পেয়েও সব-হারানোর নরকের তুলনায়।

উদগত দীর্ঘশ্বাস চাপল স্ত্রী। ছায়া-অধরে হাসি টেনে এনে বলল—পাগল। আস্ত পাগল। তুমি-আমি বহু জন্মের মধ্যে দিয়ে এমনিভাবেই এসেছি। এমনিভাবেই যাবো। শরীর যায়, আত্মা যায় না। জন্ম-জন্ম ধরে শুধু ভালবাসার টানে বাঁধা রয়েছি

যে দুটি আত্মা—তারা তো ঘুরে ফিরে আসবে ধরণীর ধুলোয়। ঘর বাঁধবে, সুখের স্বপ্ন দেখবে, দুঃখে কাতর হবে। তারপর একদিন জীর্ণ দেহ ত্যাগ করবে, মিলিত হবে পর জন্মে। এ-যে আমাদের আত্মার আকর্ষণ গো। এড়ানোর সাধ্য আমাদের কারো নেই।

অবাক চোখে চেয়ে রইলাম আমি।

কি দেখছো? প্রেমস্নিগ্ধ কণ্ঠ স্ত্রীর।

এমনভাবে তুমি তো কোন দিন কথা বলো নি? দার্শনিকতা, পুনর্জন্মবাদ, আত্মার অবিনশ্বরতা—এ-সব তো তোমার মুখে কোনদিন শুনি নি?

এখন থেকে শুনবে।

কেন?

জবাব দিল না সে। শুধু মৃদু হাসল।

বললাম—বুঝেছি। প্রেমের শক্তিতে শক্তিমতী হয়েছো বলে? প্রেমের চাইতে বড় শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নেই বলে?

এবারও চুপ করে রইল ও। তারপর বললে—আর থাকতে পারছি না গো। আজ চলি। কেমন? দুঃখ করো না। আবার দেখা হবে।

ছায়াশরীর মিলিয়ে গেল।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বুকের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল খবরের কাগজের কাটিংটা। সুইডেনের এক ডাক্তার নাকি দেখেছেন: সদ্যমৃত ব্যক্তির আত্মার ওজন মাত্র একুশ গ্রাম।

হাত

রণেন ঘোষ

সেই মাত্র বাড়ী ফিরলো নবনীতা। রাত এখন বেশ গভীর। ঘরটা অন্ধকার করে নিশ্চল পাথরের মতো বিছনায় পড়েছিল উদয়ন। সেই কোন বিকেলে বাড়ী এসেছে কারখানা থেকে। বাড়ী ঢুকতেই ঝি খবর দিল যে মা একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন। রক্তে আগুন জ্বলে উঠল বেড়ানোর নাম শুনে। ঝাঁঝাঁ করে উঠল সমস্ত মাথাটা। আবার বেড়াতে বেরিয়েছে নীতা। পই পই করে বারণ করেছে। নীতাকে নিয়ে বেরুবে বলেই তো সে কত কষ্ট করে ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে এসেছে। কিন্তু ভবি ভোলার নয়। বেড়াতে বেরুনো বন্ধ হয় নি ওর। জলখাবার দেবে কিনা ঝি একবার জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু খিদে তেষ্টা সব যেন লোপ পেয়ে গেছে। একটা কথাই কেবল ঘুরছে মাথার মধ্যে। নীতা বেড়াতে গেছে···নীতা বেড়াতে গেছে। বাড়ী ঘরদোর সমাজ সংসার মুহূর্তেই সব বিস্বাদ হয়ে গেল। ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। না, আজকে একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে। অন্ধকার দৃষ্টির সামনে দিয়ে সিনেমার মত মিছিল করে চলল পাঁচ বছরের ঘটনাগুলো। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় টন্ টন্ করে উঠল বুকটা। উঃ, কি প্রচণ্ড ভালবেসেছিল নীতাকে। জগতে কেউ কাউকে বোধহয় এত ভালবাসেনি। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল। একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে। একটা অদ্ভুত উপমার কথা মনে এল ওর। প্রেম ভালবাসা যেন একটা বিষ ফোড়া। কিন্তু ফোড়া ফাটবার ওষুধ কি? কে বলতে পারে ওষুধের ঠিকানা।

সারাদিনের ক্লান্তিতে ও নানান চিন্তায় বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘরের আলোটা জ্বলে উঠতেই তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। আলো জ্বালিয়েছে নবনীতা। কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল উদয়ন। কেমন যেন অবসাদে আচ্ছন্ন সমস্ত মন। কোন চিন্তা করতেও নারাজ ওর মন। ব্যর্থতায় ভরে উঠেছে সমস্ত জীবন। কি হবে কথা বলে। কে শুনবে ওর কথা, সারা জীবনের বঞ্চনার ইতিহাস। আস্তে আস্তে চিন্তার পোকাগুলো কিলবিল করতে সুরু করল মাথার মধ্যে। ওকে বা ওর শাসনকেই থোড়াই কেয়ার করে নীতা। যাই বলুক না কেন উদয়ন, ওর কাজ ও ঠিক করে যাবে ঘড়ির কাঁটা ধরে। আচ্ছা নীতার কি ভুলেও উদয়নের কথা মনে পড়ে না ? ওর ভালবাসা ভালো লাগার দিনগুলোর কথা ? স্মৃতির মণিকোঠায় সেই অক্ষয় দিনগুলো ? অজানা রহস্যের আবরণ উন্মোচনের রোমাঞ্চিত মুহূর্তগুলো ? সে কী কেউ কোনদিন ভুলতে পাবে ? দেহ কামনার শেষে সেই অবিস্মরণীয় তৃপ্ত শ্রান্ত ক্লান্ত রমণীয় স্বর্গীয় মুহূর্তগুলো ? সত্যি কি নীতা সম্পুর্ণ ভুলে গেছে সেসব।

জামা কাপড় ছাড়ছে নবনীতা। আপন মনে গান গাইছে গুন-গুন করে। আশ্চর্য! কথা বলার প্রয়োজনও বোধ করল না ও। কখন সে এসেছে···কী খেয়েছে···শুধু নিজের অভিসারেই মত্ত। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নীতা। পায়ের কাছে খসে পড়েছে ভায়োলেট রঙের শাড়ীটা। গতবছর এই শাড়ীটাই উপহার দিয়ে ছিল উদয়ন ওদের বিবাহ বার্ষিকীতে। শাড়ীটা পরলে দারুণ সুন্দর দেখায় নবনীতাকে। মনে হয় যেন ওর জন্যই তৈরী হয়ে ছিল শাড়ীটা। চুম্বকের মত দৃষ্টিটা ওর চলে গেল আয়নার দিকে। পট্ পট্ করে বোতাম খুলে ব্লাউজটা খুলে ফেললো। মুগ্ধ হয়ে গেল উদয়ন। বহু দিনের চেনা মানুষকে কেমন যেন অচেনা বলে মনে হল। মনের নাগাল না পেলেও ঐ দেহটাও তো সে হাতড়িয়েছে

রাতের পর রাত। প্রতিটি গলি ঘুঁজি ওর মুখস্থ। অথচ আজও কি মাদকতা ভরা ওই তনুলতা। আয়নার বুকে ভাসছে ব্রা-তে আঁটা যেন জোড়া পুষ্প ! কি অপূর্ব সুষমা মণ্ডিত সৌন্দর্য ! মনে হয় যেন শ্বেত পদ্ম পাপড়ি আড়াল করে রেখেছে জগতের শ্রেষ্ঠতম তৃপ্তির আকারকে। একতাল ননী ছেনে কেউ যেন তৈরী করেছে ঐ সুঠাম দেহ। ফরসা ধবধব করছে নিরাবরণ অঙ্গ। একটুও বাড়তি মেদ নেই কোথাও। কোমরটা অদ্ভুত সরু হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে নিতম্বে। ব্রা-র স্ট্র্যাপটা ওর মসৃণ ফর্সা পিঠের ওপর চেপে বসে এক হয়ে গেছে দেহের সঙ্গে। সব মিলিয়ে পাগল করে তুললো উদয়নকে। সব কিছু ভুলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল একবার। ফিরে যেতে ইচ্ছা করল পাঁচবছর আগের দিনগুলোতে। সঙ্গে সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কে যেন বলে উঠল, ঐ সুঠাম সুশ্রী লোভনীয় দেহটা নিয়েই তো এতক্ষণ · গরলে ভরে উঠল সমস্ত মন। প্রচণ্ড ক্রোধ আর ঘৃণায় রি-রি করে উঠল সর্বাঙ্গ। একটা নিরুপায় আক্রোশে জ্বলে উঠল উদয়ন।

কি হলো ! এখনো শুয়ে আছো ?

চমক ভাঙল নবনীতার প্রশ্নে। কিন্তু উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করল না উদয়ন।

কি, শরীর খারাপ নাকি ? গায়ে হাত দিয়ে আবার প্রশ্ন করল নবনীতা।

এক ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিল উদয়ন। বুকের যে জায়গায় হাত দিয়েছিল নবনীতা যেন জ্বালা করে উঠল সেখানে।

আমার শরীর খারাপ না ভাল জেনে লাভ কি তোমার ?

এ্যাই দেখ, দেখা হতে না হতেই ঝগড়া সুরু করে দিলে তো ? মিষ্টি হেসে আবদারের সুরে বলল নবনীতা।

ঝগড়া ? তোমার সঙ্গে করতেও প্রবৃত্তি হয়না আমার।

তাই নাকি ? তাহলে···

হ্যাঁ নীতা, সেই কথাটাই বলতে চাইছি। শুধু একটা জবাব দাও। বেড়াতে বেরুনো তুমি বন্ধ করবে কি না ?

বারে, একলা একলা সারাদিন ভালো লাগে নাকি ঘরের মধ্যে থাকতে ?

ভালো লাগুক না লাগুক, বেড়াতে যেতে পারবে না তুমি ! জোর গলায় বলে উঠল উদয়ন।

এত চেঁচাচ্ছো কেন ? তুমি তো চলে যাও কোন ভোরে ! একলা আর কতক্ষণ ভাল লাগে ঘরের মধ্যে ? তাই যদি বিকেলে একটু বেড়াতে বেরুই মহাভারত কি অশুদ্ধ হবে তাতে ?

ও সব জানিনা। বেড়াতে যাবে না, ব্যস ! আজ সকালেই বলে গেছি বাড়ী থাকতে। তা সত্ত্বেও তুমি কিনা মজা লুটেতে

কি—কি বললে ! মজা লুটতে গেছলাম আমি !!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মজা লোটা ছাড়া আর কী। যায় নি পরিতোষ তোমার সঙ্গে ? ছিঃ ছিঃ, একটা নোংরা ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে না তোমার ? এর চেয়ে বিষ খেয়ে মরতেও তো পাবো !

আবার—আবার তুমি ছোট লোকের মত কথা বলতে সুরু করলে। নিজের বউকে নিয়ে নোংরা চিন্তা করতে, নোংরা কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা করে না !

লজ্জা ! আমার না তোমার করা উচিত সেটা ভেবে দেখো একবার ! লজ্জাও যে লজ্জা পাবে তোমার চাল চলনে ! নোংরা কাজ করতে পার, আর সেটা বললেই যত দোষ, না ! নোংরা মুখে আর উচ্চারণ করো না কথাটা। নিরুপায় আক্রোশের সবটুকু বিষ ঢেলে দিল উদয়ন।

রাগে উত্তেজনায় কথা আটকে গেল নবনীতার। উঃ, দিনে দিনে এত অধঃপতন হয়েছে। মুখে আটকায় না কোন কথা ! দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে।

ছোটলোক কোথাকার। বাবা-মা হাত পা বেঁধে জলে ফেলে

দিয়েছে আমায়! কারখানার কুলীর কাছ থেকে এর থেকে বেশী কি আশা করা যায়!

ছোটলোক আমি না তোমার চোদ্দগুষ্টি! কারখানার কুলি! এই কুলির পা-ই তো ধরেছিল এক দিন তোমার বাবা!

কি—আমার বাবাকে ছোটলোক বললে। ছোটলোক তুমি—তুমি—তোমরা সকলে। উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠল নবনীতা। দুম দুম করে পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। হাঁড়ি কুড়ির আওয়াজ ভেসে এল রান্নাঘর থেকে, ঝি-র গলা শোনা গেল একবার।

ও কি—ওকি—বউদি—রান্না ভাতে জল ঢেলে দিচ্ছ কেন?

উত্তরটা কিন্তু শুনতে পেল না উদয়ন। তার বদলে খিল দেবার আওয়াজ শোনা গেল পাশের ঘর থেকে।

সামান্য কথা থেকে ঝগড়া হওয়া কোন বিচিত্র নয়। কিন্তু আজকের ঘটনা আর কোনদিনও ঘটেনি আগে। কিছুক্ষণের পর একবার মনে হয়েছিল উদয়নের এতটা বাড়াবাড়ি বোধহয় ভাল হয় নি। কিন্তু পরিতোষের কথা মনে হতেই জ্বলে উঠল উদয়ন। ক্রমে ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠতে সুরু হলো পরিতোষ আর নবনীতার অনেক কাল্পনিক সম্ভাব্য ছবি। নিজের গলাটা দুহাতে টিপে ধরার এক দুর্বার ইচ্ছা হল ওর। কিছু একটা করার জন্যে নিশপিশ করে উঠল হাতদুটো। অথচ কি করলে শান্তি পাবে তা ভেবে পেল না উদয়ন। সন্দেহের বিষে বিষাক্ত হয়ে গেছে ওর মন। মুক্তির সব পথ রুদ্ধ ওর কাছে। কি করা যায়—কি করলে—তবে কী—

থানার পেটা ঘড়িতে ভোর পাঁচটা বাজতে ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল উদয়ন। ডিউটি ভোর ছটায়। উঁকি মেরে পাশের ঘরটা দেখল একবার। না, এখনও দরজা বন্ধ। সারা রাত্রি খাওয়া হয়নি। সমস্ত শরীরটা ভীষণ হাল্কা বলে মনে হল। এক গ্লাস জল খেয়ে সাইকেল চালিয়ে সটান চলে এল কারখানায়। ধিকি ধিকি

সন্দেহের আগুনে জ্বলতে লাগল ভেতরটা। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসেও জুড়োলো না দেহমন।

কারুর সঙ্গে কথা না বলে কার্ড পাঞ্চ করে একেবারে মেশিনের কাছে চলে এল উদয়ন। অন্যদিন কাজ আরম্ভ করার আগে একবার চা খেয়ে নিত। আজ আর ভাল লাগলো না কিছু। যেন প্রতিহিংসার জ্বালা মেটাতে চাইল নিজের ওপর অত্যাচার করে। মেশিন চলছে সামনে। ওর হাত চলছে মন্ত্রের মতো। অন্ধ উন্মাদ মনটা ঘুর ঘুর করছে নবনীতার পেছন পেছন। আচ্ছা, এখন তো বাড়ী ফাঁকা। কেউ নেই। পরিতোষ যদি আসে এখন··· বাধা দেবার তো কেউ——নবনীতা আর পরিতোষের জঘন্য একটা কাল্পনিক ছবি বার বার পাক খেতে লাগলো মনের আনাচে কানাচে।

হঠাৎ হাজার হাজার ভোল্টের বিদ্যুতপ্রবাহ যেন বয়ে গেল সর্বাঙ্গে। অবশ হয়ে গেল মস্তিষ্ক। সব কিছু যেন মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। মড় মড় করে কি একটা ভাঙ্গার আওয়াজ আর বহু লোকের চীৎকার যেন শুনতে পেল উদয়ন। কনুইয়ের ওপর থেকে ডান হাতটা ওর দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল মেশিনের মধ্যে থেকে। সবাই ধরাধরি করে ওকে শুইয়ে দিল এক পাশে। পাশে পড়ে রইল বিচ্ছিন্ন হাতটা। রক্তে ভিজে গেল জায়গাটা। কনুইয়ের ওপর থেকে রক্তমাখানো সাদা হাড়টা বেরিয়ে এসেছে। কাটা হাতের আঙুলগুলো সম্পূর্ণ অক্ষত। মাংসপেশীগুলো দড়ির মতো হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে মাটিতে। ফ্যাকাশে আঙুলগুলো আধমুঠো অবস্থায় কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছে যেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতার এক নার্সিং হোমে ভর্তি হল উদয়ন। অপারেশান টেবিল থেকে যখন বেডে দিয়ে গেল তখন ও সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

কারখানার ডিস্পেনসারীতে জমা হয়ে গেল কাটা হাতটা।

পুলিশ এল যথারীতি। সব দেখে শুনে রায় দিল, না এখনই নষ্ট করতে পারবে না হাতটা। ভালো করে প্রিজার্ভ করতে হবে। পেশেণ্ট ভালো হয়ে গেলে আমরাই তখন ডেষ্ট্রয় করার পারমিশন দোব।

সঙ্গে সঙ্গে গোলাকার লম্বা একটা টিনের বাক্স তৈরী হলো। ফরম্যালডিহাইডের বদলে মেথিলেটেড স্পিরিটের মধ্যে ডুবে থাকলো উদয়নের কাটা হাত। তারপর ঢাকনি এঁটে বন্ধ করে টিনটা রেখে দেওয়া হল ডিস্‌পেন্সারীর এক কোণে।

সেই রাতে আচ্ছন্ন অবস্থায় উদয়নের মনে হলো সে ভালো হয়ে গেছে। কাটা হাতটা জোড়া লেগে গেছে ওর হাতের সঙ্গে। যদিও কনুয়ের ওপর থেকে ডান হাতটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তবু মনে হল যেন ডান হাতের আঙুলগুলো নাড়াতে পারছে। বুড়ো আঙুলটা যেন চুলকে উঠল একবার। শুধু এক দিন নয় দিনের পর দিন প্রতি রাতেই উদয়ন যেন ওর কাটা হাতের অস্তিত্ব টের পায়। মাঝে মাঝে মনে হয় ডান হাতের নখগুলো বুঝি অনেক বড়ো হয়ে গেছে। কেটে ফেলতে হবে একদিন।

পরদিন দেখতে এল নবনীতা। চোখ দুটো আরক্তিম! বেশ বোঝা যায় বহুক্ষণ ধরে কেঁদেছিল ঘরের দরজা ভিজিয়ে। এখন একেবারে বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে কেঁদে উঠল। মোটা চাদরের ভেতর থেকে ওর পেলব দেহের উষ্ণ আমেজ পেল উদয়ন। ধীরে ধীরে বাঁ হাতটা তুলে দিল নবনীতার পিঠের ওপর। কিন্তু মনে হলো বুঝি দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে নীতাকে। নীতার পাতলা চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে যেন ওর ডান হাতের আঙুল দিয়ে। বড়ো মায়া হলো নবনীতার কান্না ভেজা মুখখানা দেখে। মনে হল পাপ করা কি সম্ভব এই মুখে? না, না, সত্যিই নিষ্পাপ নবনীতা।

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলো পরিতোষ।

উদয়নদা, কেমন আছে এখন?

একনিমেষে সাহারা হয়ে গেল শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা। এক ফুঁয়ে নিভে গেল বিশ্বাসের ক্ষীণ আলোক শিখা। শতসহস্র বৃশ্চিক জ্বালায় পাগল হয়ে উঠল উদয়ন।

তুমি—তুমি এখানে কেন? কে আসতে বলছে তোমাকে? ভদ্রতাবোধের রেশমাত্র রইল না উদয়নের স্বরে।

বা রে, আসতে আবার বলবে কে? আমিই তো নীতা বৌদিকে নিয়ে এসেছি!

গুম্ হয়ে গেল উদয়ন। থমথমে মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে উঠল নবনীতা।

ব্যাপার স্যাপার দেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পরিতোষ। সঙ্গে সাঙ্গ ফেটে পড়ল উদয়ন।

ওকে সঙ্গে করে আমার কাছে আসতে লজ্জা করল না তোমার?

দেখ, মিছিমিছি তুমি রাগ করছো! কারু সঙ্গেই তো আসতে হবে আমাকে। পাড়ায় তো আর কাউকে চিনি না। তাই—

তাই পরিতোষকে নিয়ে ফুর্তি করতে আসা হয়েছে এখানে। একেবারে জোড়ায় দেখতে এসেছো।

লক্ষ্মীটি, কেন তুমি এমন ভাবছ? বিশ্বাস করো, আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। থাকলে কখনই আমি পরিতোষকে সঙ্গে নিতাম না। উত্তেজিত হয়ো না লক্ষ্মীটি। শরীর খারাপ হবে যে। মিনতির সুরে বলল নবনীতা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ সব জানা আছে আমার। আমার শরীর খারাপ করার জন্যই তো পরিতোষকে নিয়ে কাছে এসেছো। যাও, যাও, চলে যাও আমার সামনে থেকে! ইচ্ছে করছে গলা টিপে এখুনি দিই শেষ করে!

চেঁচামেচি শুনে ঘরে ঢুকলেন একজন নার্স। নবনীতাও নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

দিনের পর দিন চলে যায়। আস্তে আস্তে সেরে উঠেছে উদয়ন।

অদ্ভুত এক বিকারে ভুগছে ও। কাটা হাতটাকেই কিছুতেই ভুলতে পারে না। সব সময় মনে হয় ডান হাতটা গোটাই আছে বুঝি। মাঝে মাঝে মনে হয় ডান হাত বুঝি ও মুঠো করছে আর খুলছে। অনেক সময়ে বা হাত দিয়ে ডানহাতের অস্তিত্ব বোঝাব চেষ্টা করে।

এখন একাই আসে নবনীতা। বেশী কথা হয় না। কেবলই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রশ্ন করে উদয়ন। কোথায় কোথায় ঘুরলো পরিতোষের সঙ্গে, সারাদিন পরিতোষের সঙ্গে কেমন কাটে ওর, এমন কত কী। যতই প্রতিবাদ করে বোঝাতে চায় নবনীতা, ততই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে উদয়ন। নবনীতাকে যেন স্বীকার করতেই হবে যে পরিতোষের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আছে। আর সেটা শুনলেই যেন তৃপ্তি পাবে উদয়ন। ফলে নবনীতা বিরক্ত হয়ে ওঠে। এক নাগাড়ে কারই বা মিথ্যা অপবাদ শুনতে ভাল লাগে।

পুলিশ কিন্তু এখনও কাটা হাতটাকে নষ্ট করে ফেলার অনুমতি দেয়নি। কারণ খুবই দুর্জ্ঞেয়। টিনের বাক্সের ভিতর ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে হাতটা। মুড়ির মত সাদা সাদা ম্যাগট থিক থিক করছে। ঢাকনিটা খুললেই বাইরে আসতে চায় পোকাগুলো। বাতাস ভারী হয়ে ওঠে দুর্গন্ধে। কাটা জায়গার নীচ থেকে পচতে সুরু করেছে। মাংস পচে ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে মেথিলেটেড স্পিরিটে। পুলিশ নির্বিকার।

একদিন নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেল উদয়ন। কনুয়ের ওপর থেকে ডান হাতটা ব্যাণ্ডেজ করা।

বাড়িতে এসেও শান্তি পেল না উদয়ন। সব সময় খোঁজ খবর নিতে আসে পরিতোষ। পরিতোষ ছাড়া কে যাবে বাজার করতে, ডাক্তার ডাকতে ? পরিতোষকে কিছু বলতে না পারলেও মনে মনে দগ্ধাতে থাকে উদয়ন। সুযোগ পেলেই পরিতোষকে জড়িয়ে কুৎসিত মন্তব্য করে নবনীতার কাছে। নবনীতাও বোধহয় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এতদিনে। তাই আর প্রতিবাদ করে করে না ও। তার

বদলে এক আত্মঘাতী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় ওর মনে! উদয়নকে জব্দ করার জন্যে ওর সামনেই ঠাট্টা তামাশা করে পরিতোষের সঙ্গে। উদয়ন যত ক্ষেপে ওঠে ততই বাড়াবাড়ি করে নবনীতা। উদয়নকে শুনিয়ে শুনিয়ে পাশের ঘরে পরিতোষকে নিয়ে খুব জোরে জোরে গল্প গুজব করতে সুরু করে। দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে উদয়নের দুহাতে না, না, তা কি করে হয়! ওযে দুলো!

একদিন রাতে বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। রাত তখন নটা। পরিতোষ চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে হাত ধরে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গেল নবনীতা।

কি হলো, চলে যাচ্ছ যে বড়ো! বসো বসো। কি আর রাত হয়েছে এখন। টোরা টোরার গল্পটা বললে না আমাকে? জান পরিতোষ, তুমি চলে গেলে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

অনেক চেষ্টা করেও ছাড়ান পায় না পরিতোষ। গল্প শেষ করে বাড়ী গেল রাত এগারোটায়!

এতক্ষণ নিস্ফল আক্রোশে খাঁচায় পোরা বাঘের মত ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিল উদয়ন। এবার চেঁচিয়ে ডাকল নবনীতাকে।

শোনো··· শুনে যাও একবার।

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল নবনীতা।

এটা ভদ্রলোকের বাড়ি না প্রেস কোয়ার্টার? আকাশের বজ্র যেন শব্দ হয়ে ফুটল উদয়নের কণ্ঠস্বরে।

শুধু একবার চোখ তুলে উদয়নের দিকে তাকাল নবীনতা।

যা তুমি মনে কর! নির্লিপ্ত স্বর নবনীতার।

আমি মনে করি, না? পরপুরুষ নিয়ে বেলেল্লাপনা করবে ঘরের মধ্যে আর আমার অন্ন ধ্বংস করবে? এর চেয়ে বাজারে গিয়ে বসো না? দুটো পয়সা রোজগারও হয় তাতে।

টপটপ করে দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

তারপর জল ভরা টল টলে চোখ দুটো তাকাল উদয়নের দিকে।

এত বড় কথা বলতে পারলে তুমি? বেশ, কালই আমি চলে যাব এখান থেকে। এ মুখ আর দেখতে হবে না তোমাকে!

পাশের ঘরে ঢুকে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল নবনীতা। পাগল হয়ে গেল উদয়ন। কি করবে ভেবে পেল না। আর নয়। অনেক সহ্য করেছে—আজ আজই একটা ফয়সালা করতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুন করবে নীতাকে। তারপর জেল ফাঁসী যা হয় হোক। ব্যাভিচারিণীকে নিয়ে ঘর করার চেয়ে ফাঁসীতে ঝোলাও অনেক ভাল। কিন্তু খুন করবে কি করে? বিষ মিশিয়ে দেবে খাবাবে? লেকের ধারে বেড়াতে গিয়ে ঠেলে ফেলে দেবে জলে? অথবা ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের সামনে? কিন্তু সহজ কোনটা? বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই সব চিন্তাই করতে লাগলো উদয়ন। ভীষণ ইচ্ছে হল দুহাতে গলা টিপে মেরে ফেলাব। কিন্তু দুটো হাত পাবে কোথায় উদয়ন। একটাই তো হাত, তাও আবার বাঁ হাত! উঃ ভগবান, একবার যদি ডানহাতটা ফিরে পাওয়া যেত। অষ্টপ্রহর ডান হাতের অস্তিত্ব অনুভব করলেও উদয়ন নুলো। কনুইয়ের উপর থেকে কোন অস্তিত্বই নেই ডানহাতটার। তাহলে—

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল উদয়ন তা সে নিজেও জানে না। ভোরবেলার ঝিয়ের ভয়ার্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল।

দৌড়ে পাশের ঘরে ঢুকলো উদয়ন। ওঃ কী বীভৎস দৃশ্য! প্রায় বিবস্ত্র নবনীতা পড়ে আছে বিছানায়। বাইরে বেরিয়ে এসেছে ভয়ার্ত বিস্ফারিত চোখ দুটো। লম্বা হয়ে বাইরে ঝুলছে জিভটা। মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে বুকে। গলা টিপে কেউ হত্যা করেছে নবনীতাকে। বিশ্রী একটা পচা গন্ধে ভরে গেছে সারা ঘর। বিছানার এখানে সেখানে নবনীতার দেহে মুড়ির মত সাদা কয়েকটা পোকা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে আস্তে আস্তে। সত্যি সত্যি উদয়নকে মুক্তি দিয়ে

চির মুক্তির দেশে চলে গেছে নবনীতা।

থানা পুলিশ পোষ্টমর্টেম সবই হলো। পোষ্টমর্টেমের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে সন্দেহাবকাশে বেকসুর ছাড়া পেল উদয়ন। শুধু-মাত্র বাঁহাত দিয়ে এভাবে হত্যা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। উদয়নের তো বাঁহাতটাই মাত্র সম্বল। খুনী কিন্তু ধরা পড়ল না।

কাজে যোগ দিয়েছে উদয়ন। কয়েকদিন পরে যোগেন কম্পাউণ্ডার ডেকে পাঠাল ওকে ডিসপেনসারীতে। অনেক দিনের বন্ধুত্ব ওদের।

এ্যাই যে উদয়ন, শোন শোন। অ্যাদ্দিনে তোমার হাতটার গতি হলো। পুলিশ পারমিশান দিয়েছে ডেষ্ট্রয় করার। তা একবার শেষবারের মতো দেখবে নাকি?

বলে ঢাকনি খুলে একটা ট্রের মধ্যে উপুড় করে দিল টিনের বাক্সটাকে। পচা দুর্গন্ধে ম ম করে উঠল চারিদিক। নাকে রুমাল চাপা দিল উদয়ন। মাংস পচে থক থক করছে স্পিরিটটা। স্থানে স্থানে পচে গলে গেছে মাংস। ফ্যাক ফ্যাক করছে দুধ সাদা হাড়। আশ্চর্য! আঙুলগুলো কিন্তু অবিকৃত। আর একগুচ্ছ লম্বা লম্বা চুল জড়ানো রয়েছে আঙুলগুলোর মধ্যে।

একী! এত চুল কোত্থেকে? যোগেন কম্পাউণ্ডার তো অবাক!

কিন্তু উদয়ন? উদয়ন কি অবাক হল? না। শুধু ম্লান বিবর্ণ নিমেষহীন চোখে চেয়ে রইল চুলগুলোর দিকে। অনেক···অনেকক্ষণ পরে দু'বিন্দু উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে এল গাল বেয়ে।···

স্বর্গলোকে ভূমিকম্প

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ যাই যাই করছে—আষাঢ় আসতে আর দেরি নেই। আকাশে মেঘ উঠেছে, ঘন কালো মেঘ। ১৩৩৭ সালের পূজো আসছে। ছেলেদের জন্যে পূজা বার্ষিকীতে একটা লেখা দিতে হবে। গত দুবছর ভাবতে হয় নি; তিন ভুবনপুর বা ত্রিভুবনপুরের মধ্যিখানে আর এক ফালি ভুবন আছে—যা তিন-ভুবনের মধ্যের খানিকটা জায়গা হয়েও ত্রিভুবনের অন্তর্গত নয়। মর্ত্য ভুবনপুর পাতাল ভুবন পাশাপাশি লাগালাগি, বর্ডার ক্র্যাশ লেগেই আছে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে জল বের হয়, কয়লা বের হয়, অনেক বেশী গভীর খুঁড়ে বের করলে তেল বের হয়, গ্যাস বের হয়, কীট পতঙ্গ বের হয়; এসব জানা কথা। কিন্তু মর্ত্য এবং পাতাল ভুবনপুরের মিলিত সীমানার পরে আছে স্বর্গ ভুবনপুর; স্বর্গ মর্ত্য পাতালের তিন ভুবন। এই স্বর্গেই আছে সকল সুখের আড়ং। এখানেই বৈজয়ন্তীপুর শহরে থাকেন ইন্দ্র, গোলোকে থাকেন বিষ্ণু, কৈলাসে থাকেন শিব, ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মা, বায়ুলোকে পবন, মৃত্যুপুরে যম ইত্যাদি ইত্যাদি। যমের পর ইচ্ছে করেই থামলাম—ইত্যাদি দিয়ে সেরে পূর্ণচ্ছেদ টানলাম। কারণ এখানেই ছিট ভুবনপুরের কথা। বললে বুঝতে সহজ হবে। স্বর্গের এলাকার শেষ প্রান্ত হল মৃত্যুপুর। মর্ত্য থেকেই এস আর পাতাল রসাতল থেকেই এস—মৃত্যুপুর যমপুরী হয়ে আসতেই হবে;—না এসে উপায় নেই। সেই কারণে অর্ধেকটা এর অর্ধেকটা ওর এলাকা নিয়ে তৈরী হয়েছে ছিট ভুবনপুর। অনেকে যারা ছিট ভুবনপুর নিয়ে গবেষণা করে—তারা একে ভূত ভুবনপুরও বলে থাকে। স্বর্গ, মর্ত্য ও

রসাতলের মধ্যে বইছে বৈতরণী নদী—এই বৈতরণীর এপার ওপার দুই পারে একটা লোক—সেই লোকের আদিম স্থায়ী অধিবাসীরা সকলেই হল আসল ভূত। তারা ভূত হয়ে জন্মায়—ভূতনী তাদের মা—ভূত তাদের বাপ—আবার তারা মরে মরে ভূত হয় এবং এরা বিয়ে করে কোন ভূত মেয়েকে আর এদের ছেলেরাও জন্মায় ভূত হয়ে। এই ভূত লোকের আসল অধিপতি হলেন ভূতভাবন ভবানীপতি ভাওড় ভোলানাথ। তিন জমিদার। তাঁর সে জমিদারী তিনি পত্তনী দিয়েছেন যমচন্দ্র বর্মাকে বা যমরাজকে। সেই যমরাজ আবাব এটা দরপত্তনী দিতে উদ্যত হলে তাঁর ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট্যান্ট চিত্রগুপ্ত সেটা পাইয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের মাসতুতো ভাইকে। সেই ভাই মারা গিয়ে পর এখন তার মালিক মহামহিম মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী ঠাকুরুন। সেই গয়েশ্বরী দেবী গত ১৩৭৫ সাল থেকে আমার পেছনে তাঁর লোক লাগিয়েছেন। কি? না—এই মহৎ জগৎটির অর্থাৎ কিনা এই ভূতভুবনপুরটির মহিমা বর্ণনা করে লিখতে হবে। আমি 'না' বলেও নিষ্কৃতি পাই নি, আমাকে প্রায় লোপাট করে বাধাবাঁধি করে ভূতভুবনপুরে হাজিরও করেছিল। কেবলমাত্র মোক্ষম ক্ষণটিতে ভূত দেখে ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার ভৃত্য 'রামচন্দ্র মহারানাকে'—ওরে রাম বলে ডেকেছিলাম তাই রক্ষে; রাম নাম করতেই ভূতভুবনপুর আজকালকার একটা বেলুনের মত ফট শব্দ তুলে ফেটে স্রেফ একটুকরো রবারের মত কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেল তা বুঝতে পারি নি। তা হলেও একে মিথ্যে মনে করতে পারি না। কারণ এটা সর্বজনস্বীকৃত এবং সেবার চোখেও দেখলাম যে—মানুষ মরে ভূত হয়। তাহলে কি মরে মানুষ হয়? এ প্রশ্নের জবাব কি? তাই ওই উদ্ভট দর্শনকে মাথার গোলমাল বলে উড়িয়ে না দিয়ে—সেই কথাগুলি আমি লিখেছিলাম। তা ব্যাপারটা ছেলে বুড়োদের ভালোও লেগেছে, আবার ভাবনাও ধরিয়েছে। তাঁরা এসব নিয়ে অনেক মাথা ঘামাচ্ছেন এখন।

গত বছর ঠিক এবই জ্বের টেনে—১৩৭৩ সালের বোশেখ মাসের সেই প্রচণ্ড কালবৈশাখীব পর তিন চাবশো কি তাবও বেশী বয়সের ধর্মরাজ ও মা মনসাব বটগাছ উলটে পড়ে গেলে—বটগাছেব মবণোন্মুখ আত্মা তাব দূতদের পাঠিযে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। তার বিবরণ লিখেছি।

এবাব ভাবছিলাম তাবপবটা কি? এবাব কি লিখব—কার কথা লিখব? যম দত্ত বলেছে—লাইনটা তো ধবেছে কিন্তু চাকা যে ভাঙা এবং ফাটা। মাথার বুদ্ধিব স্থলে যে গোবর পোবা আছে। ভাবনা তো সেইখানে।

গযেশ্ববী ঠাকরুণ বেলুন চোপসানোব মত একেবাবে চুপসে গেছে—সেই ভেবে নিয়েছে গেল গয়েশ্ববী চিবকালেব মত। ধুব—ধুব—ধুর। তাহলে সেই ত্রেতাযুগে যখন দশবথ বাজাব বেটা জন্মেছে—তখন ত্রিভুবন ভূতশূন্য হযেছে। পাগল না খ্যাপা। দশরথ বাজা রামকে বনবাসে দিয়ে হার্টফেল করে মরল। মরে কি হল, কই কও দেখি?

যম দত্তেব প্রশ্ন শুনে অবাক হযে বললাম—কি হল?

কচু পোড়া খাও তুমি। তাও জানো না। সীতার কাছে বালিব পিণ্ডি খেতে রাজা দশবথ আসে নি?

হ্যাঁ, এসেছিল। মনে পড়ল বামায়ণ। আছে এ কথা রামায়ণে। বাপবে বাপ। যদি খোদ বামেব অর্ধাঙ্গিনীর কাছেই ভূত এসে বালির পিণ্ডি চেয়ে খেয়ে থাকে তাহলে গয়েশ্ববী একবাব রাম নাম শুনে বারেকের জন্য বেলুন চোপসা হয়ে গিয়ে থাকলেও যে আবার ফুলে ওঠে নি, আবার কেউ ভূতমাহাত্ম্য শুনিয়ে—ভূতভাবনের দোহাই পেড়ে ব্রহ্মদৈত্যেব আশীর্বাদ নন্দী ভৃঙ্গীর গাঁজার ধোঁয়ার নিঃশ্বাস নিয়ে, ম্যাজিসিয়ানের সেরা ম্যাজিসিয়ান গোলকের কৃষ্ণ দেবতার মন্ত্রের চোটে—আবার যে সে দ্বিগুণিত গতর নিয়ে দরপত্তনীদারণীত্ব করছে না—এ কথা কে বলতে পারে?

—কে ? গোলকপতি কৃষ্ণের ম্যাজিকমন্ত্র কি রকম জিজ্ঞাসা করছ ? আচ্ছা, তাহলে উত্তর দিচ্ছি।

স্মরণ করে দেখ—যুধিষ্ঠিরকে তিনি নরক দেখিয়েছিলেন ; দেখালেন ভীম অর্জুনেরা নবক যন্ত্রণা ভোগ কবছে—চিৎকার করছে। যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করানো হয়ে গেল। বাস তারপরই কৃষ্ণ বললেন—ওয়ান—টু- থ্রি—কিংবা সিসেম ওপেন দি ডোর কিংবা চিচিং ফাঁক—কিংবা কিছুমিছু—আর সঙ্গে সঙ্গে সব বদলে গেল। যুধিষ্ঠির দেখলেন—গোলোকের লক্ষ্মীদেবী বা রুক্মিণীকে ঘিবে চার পাণ্ডব দ্রৌপদী এবং তৎসঙ্গে আসলেব সঙ্গে সুদেব মত সুভদ্রা টুভদ্রা থেকে শালবন্দী পাণ্ডববংশ হইচই করে আনন্দ করছে। এ ওকে কাতুকুতু দিচ্ছে। ও ওব সঙ্গে গুলিডাং খেলছে, অথবা কাজকর্মের অভাবে নিদারুণ নাক ডাকিয়ে একখানা সেই তোমার ১৩৭৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ত্র বছর লম্বা একখানা ঘুম জমিয়েছে। কোথাও কোনও কোণে কি কুলুঙ্গিতে কি কোন মাকড়সার জালের মধ্যে চুপসে এতটুকু হয়ে লেগে আছে। যে কোন মুহূর্তে ঘুম ভাঙলেই গ্যাস নিশ্বাস টানতে শুরু করবে—আর বেলুন ফাঁপা হয়ে ফাঁপতে আরম্ভ করবে।

অবাক হয়ে শুনছিলাম আমি।

দত্ত বললে—বেলুন যারা বিক্রি করে দেখেছ, তাদের কাছে একটা সাইকেল কি ফুটবলে পাম্প দেওয়ার সিরিঞ্জ—যাকে পিচকিরি বলে হে—থাকে, দেখেছ ? কারুর কারুর গ্যাস ভরতি সিলিণ্ডার থাকে—ইচ্ছে হলেই এতটুকু রবারের টুকরোটাকে ফুলিয়ে এই বড় করে দেয়। এও তাই। বুঝছ না। যে কোন মুহূর্তে তিন ভুবনের কোনখান থেকে ভূতলোকের বিরুদ্ধে কোন শোরগোল উঠবে—সেই মুহূর্তে ঘুমন্ত গয়েশ্বরীর নাক দিয়ে ওই গ্যাস ঢুকতে আরম্ভ করবে। গ্যাস ঢুকবে আর গয়েশ্বরী ফুলবে। গয়েশ্বরী ফুলবে—তার ঝি দামিনী ফুলবে—তার লোকেরা ফুলবে—তার লস্করেরা ফুলবে—সেপাই ফুলবে শান্ত্রী ফুলবে ; সব রে—রে—রে শব্দ করে রেডী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা করবে—হুকুম—দরপত্তনীদারণীজী— ! বাত্ লাইয়ে।

গয়েশ্বরী জিজ্ঞসা করবে তার মেয়ে হিসাবনবিশকে—বলবে —ঘুম কেন ভাঙল, আমি কেন ফুললাম, কোত্থেকে গ্যাস আসছে— খড়ি পেতে গুনে দেখতো ওলো ও বণিককন্যে হিসেবপেত্নী !

হিসেবপেত্নী বণিককন্যে খড়ি পেতে গুণে দেখে বলবে—হুজুরাইন গো হুজুরাইন—মনিবান গো মনিবান—অবধান—অবধান— ।

ভাল করে চেপে বসে গয়েশ্বরী বলবে—বলহ ! বলহ ! বলহ !

শির সিপাহী সর্দার হেঁকে উঠবে—চু প ! চু—প ! চু—প !

সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ , শুধু চুপ নয়—চুপ-চাপ ! সেই চুপচাপেব মধ্যে একটা মশা ভন ভন শব্দে উড়েছিল গয়েশ্ববীব গায়ে বসবে বলে : এই চুপচাপেব মধ্যে সেই সরু ভন শব্দটা মর্ত্যধামের কলকাতা শহরের সকাল নটার সাইরেনের মত ভোঁ শব্দে বেজে উঠল বলে মনে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দশটা ভূতের বিশ হাতের চাপড়ের শব্দটা অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট কামান ফায়ার হল মনে হবে।

—বুঝেছ ; বেকুব লেখকচন্দ্র ! বলে—যম দত্ত আমাকে মুখ ভেঙচে দিলে।

সেই হুঁকো হাতে ঘাড় নাড়ানো তেমুণ্ডে বুড়ো পুতুল দেখেছ ? যার ঘাড়টা বাতাস বা একটু হাতের ছোয়া পেলেই—'হ্যাঁ—হ্যাঁ- হ্যাঁ তাই তো বটে'র ভঙ্গীতে ঘাড়টি ক্রমান্বয়ে দোলাতে থাকে। দেখেছ ? আমার মাথাটাও ঠিক তেমনি ভঙ্গীতেই দুলতে লাগল। - হ্যাঁ—হ্যাঁ —হ্যাঁ তাই তো বটে, তাই তো বটে।"

তা তো হল, অর্থাৎ ওই 'তাই তো বটে তাই তো বটে' কিন্তু তাতে আব আমার কি হল ? আমাব গল্প ? আমি গল্প পাই কোথায় ?

--কোথায় আবার ? তোমার সেই গাঁয়ে চলে যাও। সেই ব্রত কথার অরণ্যের মত গল্পের অরণ্য, সেইখানে। ব্রত-কথার অরণ্যে মানে বনে গাছের ডাল ভেঙে পড়লে, ডাল ভাঙলে ঢেঁকি হয়, পাতা

পড়লে কুলো হয়, ঢেঁকি নদীর ঘাটের জল ছুঁলেই কুমীর হয়, যেমন, তেমনি ভাবেই—গল্প সেখানে অল্প নয়—সেখানে ফিসফাস কথা হতে গুজব হয়—গুজব হতে গল্প হয় এবং সে গল্পে বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি হয়, সে বীচি পতে জীঁয়চ কুণ্ডের জলের সিচন দিলে —কাঁকুড় বীচি থেকে ভতো কুমড়োর লতা হয়, শাহী গাছ হয়, সে গাছ যত লম্বা তত চওড়া তত ডাল তত পালা, পাতার তো কথাই নাই ; আর তাতে ধরাতে পারলে থরে-থরে গল্প ধরে থাকে।

কথাটা কানের কাছে ফিসফিস করে কে বললে—তা বুঝতে পারলাম না ; কিন্তু কথাটা সত্যি। গয়েশ্বরী দেবী ওখানেই কাছাকাছি আছেন। স্মরণ মাত্রে টনক নড়ে। মনে কথা শুনতে পান। ওখানেই ছিল অক্ষয় বট। ছিল কেন, এখনও আছেন হয় তো। সুতরা' ওখানে যাওয়াই ভাল।

তাই গেলাম।

ট্রেনে চড়ে, মাত্র দশ মিনিট কি পনের মিনিট গেছে হঠাৎ মনে হল—ট্রেনখানার চাকায় শব্দের মধ্যে কে বলছে—গয়েশ্বরী জিন্দাবাদ! চমকে উঠলাম। ভাল করে কান পাতলাম—হ্যাঁ উঠছে। গয়েশ্বরী জিন্দাবাদ! তার সঙ্গে আরও যেন কি বলছে। কি বলছে? বলছে—'ভয়ের মধ্যে ভূতের বাস।' হ্যাঁ! বলছে।

আরও বলছে। হ্যাঁ আরও বলছে—'ভূত না-মানলে সর্বনাশ!'

ট্রেনের চাকায় ছেলেবেলা থেকে অনেক শব্দ শুনেছি। মনে পড়ছে খুব ছেলেবেলায় ঘচো ঘচো ফস ফস ঘটাটাং ঘটাটাং ফস ফস ফস ফস শব্দের মধ্যে হঠাৎ স্পষ্ট শুনতাম "কাঁচা তেঁতুল পাকা তেঁতুল ; কাঁচা তেঁতুল পাকা তেঁতুল।"

গ্রামের সব থেকে বড়লোক যাদববাবুর বাড়ির টিনের ছাদের দিকে তাকিয়ে যখন থাকতাম তখন দূরে ট্রেনটা যেন বলত "যাদববাবুর ছেঁড়া কাঁথা।'

গতবার ইলেকশনের সময় ট্রেনটা ক্রমাগতই শ্লোগান হাঁকড়াতো।

একটা ছেলের দল বলত—কংগ্রেস—

একটা ছেলের দল বলত—কম্যুনিস্ট—

অন্য একটা বলত—ফরোওয়ার্ড ব্লক—

আর একটা বলত—বাংলা কংগ্রেস—

শুধু হেঁকেই যেতো। আর ট্রেনটা আপন মনেই বলে যেতো—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আবার যে মনে করত 'মুর্দাবাদ'—তার কানে ঠিক তাই শোনাতো—মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ।

আজ স্টেশনে নামবার আগে হঠাৎ ওই শব্দটার দিকে কান দিলাম। ট্রেনটা কি বলে? ট্রেনটা তখন স্টেশনে ঢুকে থামছিল। ঘটা—টাং—ঘ—টাং ঘটা—টাংগুলো খুব লম্বা টানে শব্দ করছিল। আমি তার মধ্যে স্পষ্ট শুনলাম—খুব লম্বা করে কে বলছে—ভ—য়ে—র মধ্যে ভূ—তে—র বা—স। ভূ—ত না—থাকলে স—র্ব—না—শ।

বা—স্ বা—স্ বা—স্। বলে ট্রেনটা থেমে গেল।

সন্ধ্যাবেলা পথের ধারের গাছগুলির ডালে ডালে কান্নার ফিসফিসানি। কে যেন খুব চাপা গলায় কাঁদছে—ওরে আমার সোনা ভূত, তুই কোথা গেলি রে!

তাল গাছের মাথায় কান্না উঠেছে—ওরে আমাদের একানেড়ে ভূতরে, তাল গাছেরা যে তোদের জন্য কাঁদছে রে।

দেখলাম পৃথিবী কাঁদছে ভূতের জন্য। ভূত নেই এখন মানুষেরা থাকবে কি করে?

কিন্তু উপায় কি? উপায় নাই! উপায় নাই! হায় হায় ভূত নাই ভূত নাই।

* * *

চুপ করে ইজি চেয়ারে শুয়ে ছিলাম। আমার বাড়ির নিমগাছটা কাটা হয়ে গেছে। চারিপাশের তাল গাছগুলোর মাথা একানেড়ে ভূতেদের জন্য কাঁদছে। শালপুকুরের জলের ধারের ঝোপটা কাঁদছে—ওখানে একটা মেছুনী ভূত থাকত। আমি সেই কান্না শুনছি।

হাতের কাছে ট্র্যানজিস্টারটা নিয়ে কাটা ঘোরাচ্ছি আর ঘোরাচ্ছি। কলকাতা শিলিগুড়ি দিল্লী বোম্বাই পাকিস্তান এমন কি পিকিং একটার পর একটা আসছে। ভাল লাগছে না। ক্রমে সাড়ে এগারটা বেজে গেল। রেডিয়ো বন্ধ হয়ে গেল। বোতামটা টিপে দিলাম। সব নিস্তব্ধ। আকাশে তাবা, মাটিতে মানুষ জন্তু জানোয়ার—সাগরে সমুদ্রে মাছ শামুক গুগলি তিমি হাঙর—গাছে গাছে পাখিরা পতঙ্গেরা সব আছে, নাই শুধু ভূতেরা! একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস আপনি ঝরে পড়ল।

এমন সময় শব্দ উঠল—পি—প! পি—প! পি—প।

ভুরু কুঁচকে ট্র্যানজিস্টারটা টেনে নিয়ে দেখলাম—হ্যাঁ, রেডিয়োটার ভিতরে আলো জ্বলছে। অর্থাৎ চলছে। কি করে চলল? আমার স্পষ্ট মনে পড়েছে আমি বন্ধ করছি। সেই যে একটি মেয়ে খুব মেমসায়েবী টোনে বলে—"ওয়েদা—রিপোর্ট—ভ্যালিড—ফ—নেকসট্ টোয়েন্টি ফো—আওয়াস—। এ্যাট ড্যাম—ড্যাম—।" ঠিক ওই সময়ে বন্ধ করেছি। তবে কি করে চলল? কে চালালে?

ট্র্যানজিস্টারটা শব্দ করছে—পি—প্—, পি—প্—, পি—প্।

—শৃঁণ্, শৃঁণ্—শৃঁণ্—শুঁন—শুঁন—শুঁন শুঁনিয়ে শুঁনিয়ে শুঁনিয়ে।—ঘাঁট ভুঁবনপুর—ঘঁটি ভুঁবনপুর। ইয়ে ঘাঁট ভুঁবনপুঁর রেঁডিয়ো হ্যায়।—এ্যাটেনশন—এ্যাটেনশন প্লিজ। হাঁর এঁকসেলেন্সি গঁয়েশ্বরী বঁলছেন। বঁলছেন—কৌশল্যার বেঁটা কাঁলী গঁল্প লিঁখিয়েকে—।

চমকে উঠে ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠলাম—গ—ড! ওদিকে ট্র্যানজিস্টার বলছে—আঁমি গঁয়েশ্বরী বঁলছি। কৌশল্যার বেঁটা কাঁলী মশায়। শুঁনুন। আঁপনার কাঁছে আঁমার সেই লোকটাকে পাঁঠিয়েছি। কিন্তু এখন ভারী বিপদ চলচে ভূতদের। তাই যদি না পৌছতে পারে তাই রেডিয়ো যোঁগে বঁলছি—। ওঁ কৌশল্যার

বেটা। কাঁলী—আমি গাঁয়েশ্বরী বলছি! আঁমি আঁমার গোঁক পাঁঠিয়েছি—কিন্তু—যঁদি—

হঠাৎ শূন্যলোকে মানে ঠিক আকাশ থোক ছোট্ট একটি কড়ে আঙুলের মত আয়তনের এবং বেশ কালচে রঙের কিছু একটা সোঁ শব্দ করতে করতে প্রায় আমার মাথা বরাবরই ভীষণ বেগে নেমে এল ; সে যেন এপোলো এগার বারোর মত বেগে ; জিনিসটা এতটুকু আগেই বলেছি, কড়ে আঙুলেব মত, কিন্তু তার সোঁ শব্দটা মারাত্মক—হঠাৎ তার থেকেও মারাত্মক বাজখাঁই খোনাটে ধরনের বেলুনবাঁশির মত প্যাঁকপেঁকে (হাঁসের মত) আওয়াজে কথা বেরিয়ে এল—ধঁরুন, ধঁরুন ; লুঁফে নেন—লুঁফে নেন স্যাঁর, —মাটিতে পঁড়লে ছাতু হয়ে যাঁব।

কি কাণ্ড রে বাবা। এ যে লুফে ধরতে বলে। ওটা কি ? কিন্তু ভাবতে ভাবতেও কি জানি যেন আপনা থেকেই দুই হাতে ক্রিকেটের ক্যাচ ধরার মত কায়দায় বাগিয়ে ধরলাম ; ধরলাম তো— সেই কড়ে আঙুলের মত দ্রব্যটি আমার হাতের ক্যাচের মধ্যে টুপ করে ঢুকে গেল। ঢুকতে ঢুকতে সেটা বললে—থ্যাঙ্ক য়ু স্যার। প্রাণটা বাঁচালেন। মাটিতে পড়লে নির্ঘাত কুচুরী বা ধাতু হয়ে যেতাম।

—কিন্তু তুমি কি এবং কে ?—

বিস্ময়ের আর শেষ ছিল না আমার।

—বঁলছি, নামিয়ে দিন, না থাক, আমি নিজেই এটুকু লাফাতে পারব। বলেই তিড়িক করে লাফিয়ে উঠল সেটি। এবং মাটির উপর পড়ে চড়চড় করে লম্বা হয়ে বাড়তে লাগল। ইতিমধ্যেই হাতের স্পর্শে বুঝেছিলাম নরম নরম সলিড রবারে গড়া একটা কিছু ; তাই বা কেন—কিছু বলেই বা কি হবে স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটা পুতুল বা পুতুলের মত। মত বলছি এই কারণে যে পুতুল তো কথা বলতে পারে না, এটা যে কথা বলছে এবং গাঁক গাঁক শব্দে বলছে, শুধু একটু খোনাটে এই যা। যাই হোক পুতুলের মত অবয়বের সে

ববারের দ্রব্যটি মাটিতে পড়েই চড়চড় বা সড়সড় করে লম্বা হয়ে বেড়ে উঠল আমার সমান হয়ে। যেন একটা কাঠি বেলুন পাম্পের ঠেলায় লম্বা হয়ে গেল। প্রথম কাঠির মত লম্বা অথচ সরু তারপরই আয়তনে ফেঁপে এবং ফুলে দিব্যি নধর দেহ কালো কোলো একটি মনুষ্য দুই পাটি দন্ত বিস্তার করে বলল—চিনতে পারছেন না স্যার আমি—সেই—।

বলতে হল না। আমিই বললাম—গয়েশ্বরী দেবী—

বেগ ইওব পার্ডন স্যার বলুন মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী ঠাকরুন। বলে সসম্ভ্রমে হেঁট হয়ে মিনতি জানিয়েই যেন প্রতিবাদ জানালে।

আমার সারা অঙ্গ জ্বলে গেল যেন। বেলুন ফুটো হয়ে একটুকরো ববারেব মত হারিয়ে যায় যারা—স্রেফ একটি নাম করলে তারাই আবার—

লোকটি বললে—স্যার ভূতভাবিনী ত্রিভুবনেশ্বরী ভয়ংকরী ভূতনাথমহিষী—মহাদেবীর প্রসাদে ভূতেরা মরে বেঁচে ওঠে, বেঁচে উঠে নাচে, হারিয়ে গেলেও ফিরে আসে। ভূতের মবণ নাই। মানে আসল ভূতের। শাস্ত্রে আছে —

"ভূত বহু প্রকার। আসল ভূত ভূত হইয়া জন্মায় নাই। ভবানীপতি ভোলানাথের ইচ্ছায় তাঁহার গাঁজার সরঞ্জামের ঝুলি হইতে জন্মিয়াছে। ইহারা আসল ভূত। ইহারা জন্মায় নাই, কিন্তু আছে, ইহারা মরিবেও না কোন কালে। আর ভূত আছে—তাহারা প্রাণী হইতে মরিয়া ভূত হয়; মানুষ মরিয়া ভূত হয়। প্রাণী মরিয়া ভূত হয়।"

আমি ধমক দিয়ে বললাম—তুমি ভূত না ছাই। তোমার এত কাছে দাঁড়িয়েও আমার এতটুকু ভয় করছে না।

লোকটি বললে—ভয় করবে না কারণ আছে।

—কি কারণ?

—সমগ্র ভূতলোকে মানে ঘাটভুবনপুর থেকে শুরু করে বৈতরণীর

ওপারে যমলোক শিবলোক তাইবা কেন—সারা স্বর্গলোকেই মহাপ্রলয় গোছের চলছে।

—মহাপ্রলয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রায় তাই একরম। ভীষণ খেপেছে সব।

—কে খেপেছেন ? ব্রহ্মা!

—কি যে বলেন—বুড়ো বামুনের দাড়ির চুলগুলোই প্রায় ছিঁড়ে নিয়েছে—

—ব্রহ্মার দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েছে ?

—ব্রহ্মার দাড়ি ছিঁড়েছে, বিষ্ণুর চাঁচর চুলগুলো কাঁইচি দিয়ে খুবলে খুবলে কেটে নিয়েছে। শিব তো এ এক্কেরে নিপাত্তা। তা নিপাত্তা হলেই হবে কি—তাঁর জটা আর একগাছিও নাই। ফলে স্বর্গে জলপ্লাবন ; মন্দাকিনী গঙ্গাকে তো শিবজটা টানেল দিয়েই গোমুখী পর্যন্ত এনে মর্ত্যে বইয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন টানেল কাট অফ হয়ে গেছে। স্বর্গ জলপ্লাবিত। ওদিকে যমরাজ ঘরে খিল দিয়েছে। তার বাড়ির চারিদিকের দেওয়ালে লেখায় ভরতি। যমের মহিষটা গর্জন করছে। ভবানী মানে খোদ মা দুর্গা—তালগাছে উঠে দশহাতে তালগাছের বেগরো ধরে তালগাছটা জড়িয়ে ধরেছেন দুইপায়ে। সিংহটা গাছের গুঁড়িতে নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে।

মানেটা কি ? এ সব তুমি কি বলছ হে বাপু ? এর কি কোন মানে হয় ?

—হয় মানে ? মানে তো বেরিয়ে পড়েছে স্যার। তাই আপনারে দেখাবার জন্য তো আপনারে নিয়ে যেতে এসেছি !

—নিয়ে যেতে এসেছেন ? তার মানে ?

—তার মানে সেখানে যেতে হবে আপনাকে। আপনি সব স্বচক্ষে দর্শন করে আসবেন। গয়েশ্বরীর করুণা হয়েছে আপনার উপর—আপনাকে যেতে হবে।

—যেতে হবে ?

—নি—শ্চ—য় !

—তা হলে—বলছ মরতে হবে ?

—হবে।

—নেভার। মরতে আমি পারব না বাপু।

—তা হলে আমি আপনাকে মেরে ফেলব।

—মেরে ফেলবে ?

—হ্যাঁ। হয় আপনি নিজে মরুন, নয় আমি আপনাকে মেরে ফেলি। তবে বলে দিচ্ছি—আপনি নিজে মরলে আবার বাঁচতে পারবেন—কিন্তু আমি মারলে—একেবারে শেষ করেই ফেলব। মরতে আপনাকে হবেই। গয়েশ্বরী দেবী বলেছেন,—ঘাটভূবনপুর থেকে যমপুর হয়ে কৈলাসে কৈলাস থেকে বৈকুণ্ঠ গোলকে। সেখান থেকে ব্রহ্মলোক বৈজয়ন্তীপুর—সমস্ত জায়গায় ভীষণ ব্যাপার তুলকালাম কাণ্ড। সে সমস্ত নিয়ে ইতিহাস লিখতে হবে একখানা। তা লেখক হিসেবে আপনাকেই সিলেক্ট করেছেন।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে।

সে লোকটা এতক্ষণে আরও খানিকটা লম্বা হয়ে উঠেছে। সে বললে—মরতে আপনাকে হবেই। তা আপনি নিজেই মরুন বা আমি আপনাকে মারি। না হলে তো ভূতলোক প্রেতলোক দেবলোক যাওয়া যাবে না!

চিৎকার করে উঠলাম—তা নিজে মরব কি করে হে ? নিজে মরা যায় ?

—যায়। এক কাজ করুন—শুয়ে পড়ুন, পড়ে চোখ বুজে বলুন—আমি মরেছি, আমি মরেছি, আমি মরেছি, আমি মরেছি, আমি মরেছি রে—সঙ্গে সঙ্গে ভাবুন আপনার বাড়িতে সব কাঁদছে—স্ত্রী কাঁদছে ছেলে কাঁদছে মেয়ে কাঁদছে নাতি কাঁদছে নাতনী কাঁদছে লোকজন এসেছে, কেউ বলছে আহা আহা। কেউ বলছে যাক বাবা এদ্দিনে মঙ্গল যা হোক। আর আমি আপনার মুখের কাছে বলি—বেরিয়ে এস

বেরিয়ে এস বেরিয়ে এস, মেক হেস্ট, মেক হেস্ট—মেক হেস্ট। এরই মধ্যে আপনার নাক বা কান বা মুখ দিয়ে ভাঁড়ারের হাঁড়ি সরা বা ভাঁড় থেকে সুড়ুৎ করে একটি নেংটি ইন্দুরের মত বেরিয়ে এসে তুড়ুক করে মারবে লাফ -আর আমি আপনাকে ঘাড়ে নিয়ে এপোলো বারোর চেয়েও বেগে রওনা হয়ে যাব।

—এপোলো তের হয়ে যাবে না তো ?

-নো—নো নো। এ কি বলছেন মশায়, আপনার মুখে এমন কথা সাজে ?

– কেন ? সাজে না কেন ?

—কেন ? 'বিধির বিধান' অর্থাৎ 'কনষ্টিটুশন' পড়েছেন তো ? মানুষীর পেট হইতে মানুষ জন্মিবে। জন্মিবে পৃথিবীর মাটির উপর। সে উড়িতে পারিবে না। জলে ভাসিতে পারিবে না। মাটিতে হাঁটিবে এবং দুই পায়ে হাঁটিবে এবং একদিন মরিবে। মরিবার আগে খাবি খাইবে। খাবির সঙ্গে প্রাণ বাহির হইবে। হইবামাত্র যমের দূত তাহাকে কপ করিয়া মাগুর মাছের মত কিংবা ডানাভাঙা পাখির মত ধরিয়া লইয়া সাঁ করিয়া বৈতরণী পার হইয়া যমপুরে লইয়া আসিবে।

কথাগুলা জানা বটে। হ্যাঁ জানি। বোবার মত চুপ করে থেকে কথাটা স্বীকার করে নিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল- গয়েশ্বরী এবং ঘাটভুবনপুরের কথা। আমি বলবার জন্যে মুখ নিয়ে মুখিয়ে উঠেছি এমন সময় লোকটা বললে --বুঝেছি। গয়েশ্বরীর কথা বলছি।

দেবতাদের পার্লামেণ্টে—মাঝখানে কাজের ঝঞ্ঝাট কমাবার জন্য খাস দেবতাদের শাসনব্যবস্থা—অপদেবতা উপদেবতাদের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। সোজা ব্যাপার। জমিদারী সিস্টেম চালু হল। মরণের পরের পরলোকটা জমিদারী দেওয়া হল শিবকে। শিব আবার সেটা পত্তনী দিলেন যমকে। যম দিলেন—গয়েশ্বরীকে দরপত্তনী। বুঝেছেন ?

বললাম—বুঝেছি—

বলবামাত্র লোকটা ; না, লোকটা নয়, গয়েশ্বরীর সেই গোমস্তা বা হিসেবনবিশটা হঠাৎ হাত দুটো বাড়ালে আমার গলার দিকে এবং দাঁতগুলো বের করে আমরা যেমন করে ছেলেদের ভয় দেখাই ঠিক তেমনি করে—'ভূতোশিনি' মানে ভূতের মত চেহারা ও ভঙ্গি করে এগিয়ে এল। টিপে ধরবে গলা।

সে বললে—না—প্রথমে আঁচড়ে ফেলব, তারপরে বুকে বসব, তারপর এই মড়াপোড়ানো বাঁশের মত হাত দুখানি দিয়ে গলা টিপে ধরে মারব চাপ, শব্দ উঠবে কোঁক কোঁক। হেঁচকির খাবির মত কোঁক—

আমি ছোট ছেলের চেয়েও বেশী ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। বুকটা ধড় ধড় করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটা কিছুর মত আমার গলা থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এলাম আমিই।

ওই কড়ে আঙুলের মত আকার আয়তনের এক আমি। আর এক আমি মানে আমার সাড়ে তিন হাত লম্বা এবং দেড় হাত ফাঁদলের দেহটা দেখলাম পড়ে আছে ইজিচেয়ারের উপর, তার চোখ দুটো ছানাবড়ার মত ড্যাবা ড্যাবা হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হাত পা নড়ছে না—অসাড় নিস্পন্দ।

গয়েশ্বরীর সেই লোকটা তখন খুব খুশী হয়ে ফ্যাক ফ্যাক শব্দে হাসছে ; আর তার সঙ্গে হাততালি দিয়ে উল্লাস ভরে বলছে ওয়েল ডান—ওয়েল ডান। শীল্ড ফাইন্যালে ক্লীন গোলের বলের মত বেরিয়ে এসেছেন আপনি। ভেরি ভেরি ওয়েল ডান। কিন্তু আর সময় নেই —রেডি। সেই ব্রতকথার কথার মত তুলোর চেয়েও হাল্কা হোন বাটুলের চেয়ে ছোট্ট হোন—আমরা একেবারে গিয়ে ব্রহ্মাণ্ড লোকের পার্লামেন্টের সামনে পৌঁছুব।—ওয়ান—টু—।

* * * *

থ্রী—ই—ই—।

তারপরই সে এক প্রচণ্ড সোঁ-সোঁ-সোঁ শব্দ।

আমার তো প্রায় জ্ঞান লোপ পেয়ে আসছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম—সোঁ-সোঁ করে আমরা শূন্যলোকে ছুটেছি, কিন্তু কিভাবে ছুটছি কিসে চড়ে ছুটছি কত মাইল স্পীডে ছুটছি তা বুঝতে পারছিলাম না, ভয়ে জ্ঞান হারাচ্ছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে একটু আত্মস্থ হয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা।

আশপাশ দিয়ে তো কিছুক্ষণ মেঘ—মেঘ আর মেঘ। মেঘের পুঞ্জগুলোকে নীচে ফেলে চলতে লাগলাম; দুপাশে কালো ভেলভেটের মত মনোহর অন্ধকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল অন্ধকারে যেন গিলে ফেললে -আমি নিজেকে নেড়েচেড়ে বুঝলাম আমি সেই কড়ে আঙুলের মাপের আমিই আছি— খানিকটা গুটিয়ে গুটিয়ে অনেকটা মার্বেলের মত হয়ে কিছুর মধ্যে ঝুলতে ঝুলতে যেন ছুটে চলেছি।

আমি হাতড়াতে লাগলাম। একটু নড়তে নড়তে চেষ্টা করলাম। অমনি একটা ঝাঁকি খেলাম। সেই সঙ্গে খোনা গলায় বুঝতে পারলাম গয়েশ্বরীর দূত প্রেতশিলার ইজারাদার এবং হিসাবনিকাশ-নবিসের খোনা আওয়াজ। সে বলল—এই—এই—এই মশায় কাতুকুতু লাগছে আমার, আপনি নড়বেন না, আঙুল নাড়বেন না, সুড়সুড়ি লাগছে। আমি বেচাল হলে পথ হারাব।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—তিন ভুবনপুরের মহারাজার রাজধানীতে।

—সে আবার কোন্‌টা? ব্রহ্মলোক না বিষ্ণুলোক না শিবলোক?

—এসব নো নো নো। এর কোনটাই নয়। এ সব হল নকল ঈশ্বরের নকল রাজধানী। এ হল একমেবাদ্বিতীয় অবাঙমনসোগোচর ঈশ্বরের রাজধানী। ঈশ্বরের নাম হল জামকাটা ভগবান। এর রাজধানী হল অলীকপুর।

- কি বলছ এ সব তুমি? এতকাল কেউ কোন কালে যা শোনে নি, তাই শোনাচ্ছ তুমি—আর আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে?

—আরে আমরাই কি জানতাম ? হঠাৎ কোন দিকে কি হয়ে গেল। বুঝেছেন। মর্ত্যে সব বিপ্লব হল আর তার ঢেউ এসে লাগল প্রথম ভূতলোকে মানে অপদেবতা লোকে—তারপর উপদেবতা লোকে—তারপর দেখতে দেখতে যমলোকে শিবলোকে বিষ্ণুলোকে ব্রহ্মালোকে ইন্দ্রলোকে বায়ু বরুণ হয়ে হঠাৎ লাগল গিয়ে একটা আলোয় আলোময় একটা লোকে—শুনলাম তারই নাম অলীকপুর। অচিনলোক, জল নাই মাটি নাই বাতাস নাই আগুন নাই শুধুই সেখানে শব্দ উঠছে বোম বোম বোম বোম। ভয় করবেন না আপনাদের মর্ত্যের বোমা নয়, বোমা এখানে ফাটবে না। যাক গে —আসল কথা বলি শুনুন—এখন এই অলীকপুর বা অচিনলোকের সর্বময় অধিকর্তা—আমরা আগে বলতাম মহারাজা রাজাধিরাজ সম্রাট, এখন তাঁর সে সব টাইটেল তিনি নিজেই ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তিনি অধিনায়ক। একদল বলে সর্দার, একদল বলে হেড মেকানিক। আবার কেউ কেউ বলে সেই হল মেসিন। ইতিমধ্যেই জমিদারি অ্যাবলিশন হয়েছে, শিব যম এমন কি গয়েশ্বরীর যাবতীয় অধিকার যাই যাই করছে। এখন সুপ্রীম কোর্টে মামলা হচ্ছে। জমিদারি পত্তনীদারী দরপত্তনীদারী থাকবে কিনা বিচার হচ্ছে।

মাথার মধ্যে শিরা উপশিরা মস্তিষ্ক বা ঘিলু সব একেবারে জট পাকিয়ে গেল ;—মনে হল বুদ্ধি অনুমান বোধ কল্পনা সব যেন একটা তকলিকে জড়িয়ে ধরে তকলির সঙ্গে বনবন শব্দে পাক খেয়ে সুতো বনে যাচ্ছে, হয়তো বা আর এক পাক খেলে ছিঁড়ে কুঁকড়ে জটপাকানো রাঁধুনী বামুনের পইতের মত দড়িদড়া হয়ে যাবে। আমি হয় তো, হয় তো কেন নিশ্চয় পাগল হয়ে যাব। আমার ভাগ্য ভাল যে ঠিক এই সময়েই গয়েশ্বরীর হিসেবনবিস এবং এবারকার রকেট তুল্য ওই ভূতপ্রবরটি ধুপ করে একটি শব্দ তুলে থেমে গেল। আমার গায়ে একটু ঝাঁকানি লাগল মাত্র। এবং একটা খোনা খোনা কোলাহল শুনলাম—এঁসেছে—এঁসেছে—এঁসেছে।

কেউ যেন আমার সেই কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতুল্য ক্ষুদ্র দেহখানিকে হাতের মুঠোয় খাবলে ধরে কোন একটা ঝুলি ঝাপটার মত কিছু হতে টেনে বের করে আস্তে আস্তে দাঁড় করিয়ে দিলে।

আমি দেখলাম—আমার সামনে একটা গোল পিণ্ডাকৃতি কিছু রয়েছে এবং সেটা যেন আস্তে আস্তে পাক খুলে আয়তনে ফুলে ফুলে সোজা হচ্ছে। হঠাৎ তার মুখখানা নজরে পড়ল। ও! ইনিই তো সেই গয়েশ্বরীর এজেন্ট। হেসে দাঁত বার করে বললে—কেমন লাগে নি তো?

বললাম, না, তা লাগে নি। কিন্তু আপনি তো রকেট চালাচ্ছিলেন—এমন হলেন কেন?

সে আরও হেসে বললে—আমিই তো রকেট।

বিস্ময়ের অবধি রইল না আপনিই রকেট? তা কি করে হয়।

সে বললে- হয়, ভূতের দেশে সব ঘটে।

ভূতেরা সব পারে। আপনাকে আমার পকেটে পুরে—ভূতনাথের দোহাই দিয়ে যোগ ব্যায়ামের হলাসনের মত ঘাড়ের মোচড় দিয়ে পা ঘুরিয়ে—ফের আর এক পাক পা ঘুরিয়ে গোলাকার রকেট হলাম এবং স্মরণ করলাম নন্দীভৃঙ্গীকে। নন্দীবাবা পো করে গাঁজার কল্কেতে টান দিলেন। সেই টানে টান পড়ল, আমি উঠলাম শূন্যলোক,—বাস এসে নামলাম অচিনপুরে অলীক লোকে। এঃ এঃ এই এসেছেন গয়েশ্বরী হুজ্‌রাইন।

–এঁস এস—লেঁখক এঁস। ভাঁবছিলাম—এঁখনও এঁলে না কেঁন? কত কাণ্ড যে হঁয়ে গেল। ভারী ঝাঁঝালো ঝাঁঝালো বক্তৃতা হঁয়ে গেল। তা সেঁ গুঁলোর নোট রেঁখেছি কিন্তু—চোঁখে দেখলে যেমন হয় তেঁমনি কি শুনে হতে পাঁরে!—

আমি সবিনয়ে বললাম—আমাকে সব বুঝিয়ে একটু যদি বলতেন—

ঠিক এই সময়ে নাদুসনুদুস পঞ্চাশ ইঞ্চি ভুঁড়ি চার ফুট লম্বা এই দুখানি হাত এই দুখানি গোদা পা, পরনে হাতি পাঞ্জাপাড় শাড়ি

—হাতে মোটা দুগাছা বালা—এক হাত করে চুড়ি, গলার হার—নাকে এই মোটা একটা ওপেল পাথরের নাকচাবি—সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর একজন মহিলা এসে বললে—বাবাঃ—বাবাঃ—পাকা বিশ পসুরি ওজন নিয়ে নড়া যায় না চড়া যায়। পাঁচ সেরে পসুরি—বিশ পসুরি—মানে পাঁচকুড়ি শ'—একশো সেরে আড়াই মন ওজন আমার গতরের। থপথপ করে আসতে দম বেরিয়ে গেল—দরদর করে ঘাম ঝরছে।

গয়েশ্বরী বললে—খাটে চড়ে এলে না কেন?

—আক্কেল খুঁব। খাঁটে কি আর কেউ শ্মশানে আসে? পাব কোথা?

—তা হলে খাটিয়া কি বাঁশে ঝুলেও তো—

—ওরে বাঁবা। বইবে কে গো?

—কেঁন? এখনও তো শেষ কোর্টের রায় হয়নি, আর বিধান কুস্তির আখড়ায় শেষ আইন পাস হয়নি! ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নিয়ে এলেই পারতে!

—তা দেখুন সেও লজ্জা লাগল। মা গো! এই গতর নিয়ে বাঁশে ঝুলে কি খাটিয়ায় বঁসে আসব—আর যত সব চ্যাঙড়ারা যা তা বলবে।

গয়েশ্বরী বললে—আঃ কি সুন্দরীই না ছিলে তুমি? আর কি হয়ে গেছ—গতর হয়ে—

মহিলা বললে—বল না বল না লজ্জায় মরে যাই। তখন মরেছিলাম তখন সাত পসুরি তিন সের—মানে দুসের কম একমন ওজন ছিল—ছিপছিপে চেহারা; আলতা পরে সিঁদুর পরে শ্মশানে নিয়ে এসেছিল। লোকে বলেছিল—লক্ষ্মী ঠাকরুন চলেছে রে।—আর এখন। এই আসবার পথে যমপুরের ওজনের যন্তরে ওজন নিলাম তো এক্কেরে পাকা বিশ পসুরি; একশো সের; কে-জি কত জানি না, মনের ওজনে আড়াই মন। কাঁচি না পাকি।

আমি খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওগো পিসীমা কোথায় গো

বলে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। আমার পিসীমাও তো এইখানেই কোথাও আছে। এ যে কিছুই বুঝতে পারছি না। গয়েশ্বরীকে চিনি। কিন্তু আড়াইমুনি এই মহিলাটি কে?

সঙ্গে সঙ্গে দুই পাটিতে বত্রিশখানি পান জরদা খাওয়া কালো কালো তরমুজ বিচির মত দাঁত মেলে মহিলাটি বললেন—অই দেখ বাবা। নিজের কথাই সাত কাহন করে কইছি। তোমার সঙ্গে কথাও বলি নাই। অথচ দেখ, আমার বাড়িতেই তুমি থাকবে। আমি বাবা—বন্দরের গিন্নীভূত ঠাকরুন।

বন্দরের গিন্নীভূত ঠাকরুন। চমকে উঠলাম! বলেন কি! তিনি ত একশো দেড়শো বছর আগে মর্ত্যধামে ভূত হয়ে থাকতেন বন্দরের বণিকদের বাড়িতে। তার আগে মানে জীবিতকালে সেই বাড়ির বউ ছিলেন। বউ ভূত ক্রমে গিন্নীভূত হয়েছিলেন। সারারাত্রি ধরে বন্দরের বণিকদের ভাঁড়ারে বাসনের ঘরে লক্ষ্মীর ঘরে — এঘরে ওঘরে কাজ করে বেড়াতেন। চাল মাপতেন ডাল মাপতেন— মশলাপাতি দেখতেন। বেশী খরচ হলে বকতেন। তরকারির ঘরে বেশী তরকারী কুটলে হাত থেকে তরকারী কেড়ে নিতেন। বঁটির উপর থেকে ঠেলে ফেলে দিতেন। একবার একটা ঝি এসেছিল— তার চুরি করে খাওয়া অভ্যেস ছিল। সে চুরি করে খেতে গিয়ে মহা বিপদে পড়েছিল, বাড়িতে মিষ্টি এসেছিল ছানাবড়া। সেই ছানাবড়া সে একসঙ্গে তিনটে মুখে যখন পুরেছে তখন শূন্যলোক থেকে কেউ যেন চুলের মুঠোয় ধরে দে গমাগম কিল। পিঠে তার অদৃশ্য কেউ গুমগুম শব্দে কিল মারতে শুরু করেছিল। শেষে সে মিষ্টি উগরে ফেলে রেহাই পায়। তারপর বাসন-কোসন নিতে হবে —আগে দরজায় দাঁড়িয়ে বলতে হত—ঠাকরুন গো দশখানা থালা দশটা গেলাস বিশটা বাটি নেব। বাড়িতে কুটুম এসেছে কি ওই বামুনদের বাড়ি কুটুম এসেছে—ওরা চাইতে এসেছে। কথার উত্তরে খোনা স্বরে গিন্নী সাড়া দিতেন—নে। কিন্তু ভাল করে মাজিয়ে

নিস। যেন সকড়ি না লেগে থাকে। হ্যাঁ? আর দেখিস যেন বাসন বদল করে না নেয়! হাতে করে তুলে ওজন দেখলেই ধরতে পারবি। আমাদের সব ভারী ভারী জিনিস।

তাঁর ছেলে বউ অল্প বয়সে মারা যায়, তারা ঘাটভুবনপুর থেকে বৈতরণী পার হয়ে যমপুর থেকে বউ গেছে স্বর্গে, ছেলে গেছে নরকে। ছেলে সুদি কারবারে লোকেদের সর্বনাশ করেছিল। তাই গিন্নী ভূতগিন্নী হয়েই থেকে গেলেন। তখন মানুষ নাতি মানুষ নাতবউ—ঘরের কর্তা গিন্নী। কর্তা গিন্নী না ছাই, ভূত গিন্নী বলতেন মরণ, গাল টিপলে দুধ বেরোয় ওরা আবার কর্তা গিন্নী। ওদের বলেছিলেন—কোন ভয় নেই আমি আছি। আমি কড়িকাঠের ফাঁক থেকে বলে দেব কখন কি করতে হবে। কিসে কি করতে হবে। বুঝলি।

তাই বলতেন।

—ও নাতবউ। ওই নতুন চাকরটা চোর। বুঝলি ওকে তাড়া।

ও নাতি—ওই ওপারের বাবুদের সঙ্গে যে মামলাটা লেগেছে—ওটা মিটিয়ে নে। বুঝলি। ভাল হবে। আর দেখ ওই গরিব খাতকটার সুদটা সব ছেড়ে দে। আর শোন, শুনছি না কি তুই ভয় পেয়ে ওই বড়লোক শয়তানদের কাছে হেঁট হয়ে ন্যায্য জায়গাটা ছেড়ে দিবি? খবরদার। তা হবে না।

এ সব হত দুপুর বেলা, খেয়ে দেয়ে নবীন ছোকরা ঘরের মালিক মালিকানি যখন শুতেন তখন। রাত্রিবেলা ডাকতেন না। বলতেন—না ভাই রাত্রিবেলা বিষয় কথা কি? রসের কথা বল নয় তো ধর্মকথা বল।

মধ্যে মধ্যে বিকেলবেলা কি যে কোন সময়ে খোনা গলায় চড়া আওয়াজে ডাক শোনা যেত—ওঁলো—অঁ—নাঁ-ত বঁ-উ: ওঁ—লো—!

নাত বউ যেখানে থাকত ছুটে আসত। কি?

—ওঁলো, গাঁয়ে কায়স্থ বাড়িতে কুটুম এসেছে। ওদের বাড়িতে

সংস্থান নেই। একটা সিধে পাঠিয়ে দে। নয় তো বলতেন ওদেব গুষ্টীসুদ্ধ নেমন্তন্ন করে পাঠা।

এই বন্দবের গিন্নীভূত।

না। এও হল না। একবাব নাতবউয়ের উপব রেগে সে এক তুমুল কাণ্ড কবেছিলেন তা না বললে সব বলা হবে না। ওই নাতবউ যখন মবল তখন নাতবউ ভূতযোনি পেযে বললে—তুমি এবাব মর্তাধাম ছেডে ঘাটভুবনপুবে যাও, সেখানে গিন্নীভূত হযে থাক। গিন্নীভূত বলেছিলেন—"সেখানে বাড়ি কোথা তাই গিন্নীগিবি কবব? তুই যা সেখানে, আমাদেব বাগানে উল্টে যাওযা শিমূল গাছটা ভূতগাছ হযেছে, সেইটেব ডালে গিযে সংসাব পাতগে। আব নয তো চলে যা ঘাটভুবনপুব, বুঝলি।"

তাবপব তিন দিন তিন বাত্রি ঠাকুমা ভূত মানে গিন্নীভূত আব নাতবউ ভূতচুলোচুলি ঝগড়া কবছিল, সাবা বন্দব গ্রামেব লোক ভযে কেঁপে সাবা হযেছিল। বাম নাম কবে বক্ষে পাযনি। গিন্নীভূত মববাব সময বামকবচ পবে মবেছিলেন। কবচটা সোনাব ছিল না, তামাব কবচ ছিল, তাই আব কেউ খুলে নেযনি, চিতায তাঁব অঙ্গেই ছিল তাঁব সঙ্গেই পুডল। তাই সেটা ভূত হযেও তিনি পবে আছেন। নাতবউযেব ছিল পাঁচঠাকুবেব কবচ। সেই কাবণে মানুষেবা যাই করুক পূজোআচা, বামনাম, হবিনাম, পীবনাম সব ডোন্টকেযাব কবে দুই বেডালেব ঝগডাব মত 'এ্যাঁ-ও এ্যা-ও খ্যাঁও-খ্যাঁও খবো খবো' হেন ঘোব বব তুলে ঝগড়া কবেছিল। তাবপব মীমাংসা, নাতবউ ভূতকে হাব-মেনে বন্দবেব বাড়ি ছেডে বাত্রেই আসতে হযেছিল। আব বন্দবেব সেই প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাড়িটাব আনাচে-কানাচে অলিতে-গলিতে, কোণে তাকে বাগানে বনে বাদাডে ইচ্ছামত গিন্নীগিবি কবে বেডাতেন। সাবা বাত্রি চাল মাপতেন, ডাল মাপতেন হিসেবনিকেস করতেন আব খোনা গলায বাড়িব লোকদের শাসন কবতেন।

ইনি সেই বন্দরের গিন্নী ভূতনীমা। অত্যন্ত গদগদ হয়ে গেলাম। বললাম—মা ! আপনি সেই গিন্নীমা ?

হ্যাঁ আমি সেই গিন্নীমা।

-মর্তাভমির সেই বাড়ি ছেড়ে তো আপনার এখানে আসবার কথা নয়। কিছু মনে করবেন না। দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাবেন না যেন।

হাত দুটি জোড় করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই তাঁর দন্ত, যে সে দন্ত নয় পানজর্দাব ছোপধরা কালচে রঙের তরমুজের বিচির মত দুই পাটি দন্ত বিকশিত হল। ভাগ্য ভাল যে তিনি হাসতে হাসতে দাঁত বের করলেন না-হলে অর্থাৎ রাগ করে ভয় দেখাবার জন্যে দাঁত দেখালে আমার দাঁতে দাঁতে দাঁতকপাটি লেগে যেত।

হাসতে হাসতে তিনি বললেন—এই না-হলে নিকিয়ে রে বাবা ? জেঁরা কেমন দেখ ! ঠিক ধঁরেছে গো ' তাইতো মামলা জিতেছি যখন তখন তো আমার বন্দরের বণিক বাড়িতে মর্তাধামে থাকতে হয় ! এখানে কেন ? ধরেছ ঠিক বাবা। তা শোন। আমার ববাতের বিবরণ শোন। আমার বরাতে এখনও শ দুই বছর মর্ত্যধামে থাকার কথা। কিন্তু হল কি জান ? এই যে সব দেশে নানান ধয়ো উঠল বাবা, দেশ স্বাধীন হল ; জমিদারী গেল ; পত্তনী গেল ; তার সঙ্গে সব-সমান ধুয়ো উঠল। রামছাগলে দেশী ছাগলে ভেদ রইল না, বামুন টামুনে একাকার সব সমান। সেই ধুয়োতে বাবা বন্দরবাড়ি ওয়ারিসরা ওই পুরোনো বাড়িখানা বিক্রি করে দিলে। কিনলে বাবা একজন নতুন বড়লোক। সে বাবা বাড়ির ভিতে বারুদ ঠেসে দিয়ে বাড়িটাকে ভেঙে দিলে। একেবারে মাঠ বানিয়ে দিতে তার ওপর ফ্যাক্টরী না কি করেছে বাবা !

খোনা খোনা গলায় আপসোসের সুরে ঠাকরুন বললেন—লোহার কঁড়ির খাম আর লোহার চাঁল কাঁঠামো করে পেঁরকাণ্ড চালা বাঁনিয়েছে বাঁবা। পঁরদার বাঁলাই নাই। এঁপার থেকে ওঁপার সোঁজা দেখা যায়। কোথাও যে একটুন আড়াল দেখে আবরু রেখে নিজের

কাপড়টা সরিয়ে খোলাম কুচি দিয়ে গরমের দিন ঘামাচি মারি পটপটিয়ে তার উপায় নাই। আর কি শব্দ! তাছাড়া ফাঁকা পেয়ে যত রাজ্যের কাঁক-কোকিল, ইঁদুর বাঁদর ভূত হয়ে সে এই চালায় ঢুকে সারারাত মচ্ছব করছে। দারোয়ান ভূতকে ডাকলাম তো দারোয়ান ভূত নাই চাকর ভূতকে ডাকলাম তো সে নাই, বাবা পাইক নন্দী গোমস্তা নায়েব কেউ রইল না। তখন এলেন এই মজুমদার গয়েশ্বরী ঠাকরুনের হিসেবনবিস। গয়েশ্বরীই তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমার কথা শুনে মজুমদার বললে, নতুন আইন পাস হল। ভূত থাকবে না। তাই তারা চলে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তা তো হল, তারা তো গেল, এখন আমি যাব কোথা? বললে আপনিও থাকবেন না। আপনাকেও যেঁতে হবে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাব? বললে ইচ্ছে করলে আপনি ভূতযোনি থেকে মুক্ত হয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারেন। বললাম, হাওয়া? বললে, হ্যাঁ।

ভূত হতে ভয় লাগেনি বাবা। মিথ্যে বলব না যখন মরেছিলাম তখন বয়স অল্প ছিল তবুও মরতে ভয় পাইনি, তার কারণ হল মরবার সময় বুঝতে পারিনি মরছি। পড়ে গিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় মরেছিলাম তো। কিন্তু ভূত থেকে মুক্তি পেয়ে হাওয়া হতে ভয়ানক ভয় লাগল। তাই হিসাবনবিস মজুমদারকে বললাম, মজুমদার, হাওয়া তো হতে পারব না বাবা। ওরে আমার বড় লাগছে। এমন সুখের ভূতজন্ম!

মজুমদার বললে, তা হলে এখন গয়েশ্বরীর ঘাটভুবনপুরে চল মা। সেখানে আমাদের যে বাড়িটা ভেঙেছে, সেটার আত্মা রয়েছে।

—বাড়ির আত্মা? বিস্ময়েরও শেষ রইল না।

মজুমদার বললে, আত্মা সবারই আছে। কীটপতঙ্গ অণুপরমাণু যা মরবে, বিশেষ করে অপঘাতে, যেমন, আপনার বন্দরের বাড়িটা গোড়ায় বারুদ ঠেসে ফায়ার করে ভেঙেছে। এ তো ভীষণ অপঘাত।

যেমন আপনি। তেমনি ভাবে বন্দরেব বাড়িটা ভূত বা ভূতবাড়ি হয়ে রয়েছে এখানে·· সেখানে থাকুন। যেমন গিন্নী হয়েছিলেন তেমনি থাকুন। চাল মাপুন, ডাল মাপুন, নুন মাপুন, তেল মাপুন।

—চাল ডাল তেল নুন কোত্থেকে আসবে গো!

মজুমদার বললে, কেন, গয়াক্ষেত্র থেকে, প্রেতশিলা থেকে। নদনদীর ঘাটেব এতীর্থ ওতীর্থ থেকে, এব বাড়ি ওব বাড়ি তার বাড়ি থেকে। ভেবে দেখুন না, পৃথিবীতে প্রতিদিন কত শ্রাদ্ধ হচ্ছে। কত পিণ্ড পড়ছে। শুধু ভূতদের জন্য অবান্ধব বান্ধব, অন্যজন্ম বান্ধব বলে পিণ্ডি পড়ছে। তাবপব অগ্নিদগ্ধা অপুত্রক মৃত বলে কত পড়ছে ভাবুন। সে স-ব আসছে এই ঘাটভুবনপুরে গয়েশ্বরী দেবীব ভাণ্ডারে। পরিপূর্ণ ভাণ্ডার। আর কি বলব আপনাকে ভূতেবা যা চোব না, তার তুলনা আর মেলে না, মর্ত্যে এত চোর নাই স্বর্গেও নাই, পাতালেও নাই। এরা সব ভয়ংকব চোর। যাচ্ছেতাই চোর। দেবতাদের পিণ্ডি প্রথম আসে, তাবপব এখান থেকে গোলকে যায় দেবালোকে যায়; তা বলব কি ভূতগুলো মাথায় বয়ে নিয়ে যাবার সময় সব মুঠো মুঠো মুখে পুরে খেতে খেতে যায়। আপনি গিন্নীগিরি করবেন আব এই সব তদারক করবেন। তার সঙ্গে এই চোরভূত বেটাদেব কিল মেরে চড় মেরে ঝাঁটা মেরে শায়েস্তা করবেন। তাছাড়া কে কোত্থেকে আসছেন তাঁদের যত্ন-আত্তি কববেন। যেমন বন্দরেব বাড়িতে করতেন। এই আর কি। মা গয়েশ্বরী তো এখন খুব ব্যস্ত। বলেন, ওরে মজুমদার আমার মরবার সাবকাশ নেই। প্রকাণ্ড মামলা ঝুলছে মাথার ওপর! স্বর্গ মর্ত্য রসাতল, স্বর্ণভুবনপর মর্ত্যভুবনপুর পাতালভুবনপুর ঘাটভুবনপুর বাজেভুবনপুর···তাই বা কেন সোজা চৌদ্দ ভুবন বলাই ভাল, চৌদ্দ ভুবন নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড।

* * *

বন্দরের গিন্নীভূত বলছেন আমি শুনছি···লেখক রামকালী।

রামকালী আমার ছদ্মনাম। বিশেষ করে ভূতের গল্প লেখার নাম এটা। ভূতকে বলতে সুবিধে···জানিস আমার নাম রামকালী।

আমরা যাচ্ছিলাম বন্দরের বাবুদের যে-বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়েছে মর্ত্যধামে এবং যে-বাড়িটা অপঘাত মৃত্যুর জন্য (বারুদ গোড়ায় ঠেসে আগুনে লাগিয়ে ভেঙে ফেলা হেতু) ভৌতিক দেহের বাড়ি হয়ে গজিয়েছে সেই বাড়ির দিকে। আমার ভার পড়েছে তার উপর। গয়েশ্বরী ভার দিয়েছেন নিজে।

আমার বুক ঢিপঢিপ করছে মাঝে মাঝে! ভাবছি · আমিও কি ভূত হয়ে গেলাম?

গিন্নীভূত অন্তর্যামিনীর মত হেসে বললেন···না না। এখনও মরনি। মরবেও না। মরেই যদি যাবে বা মরেই যদি গিয়ে থাক, তবে এত করে লোক পাঠিয়ে আনবার দরকার কি? তাহলে তো তোমাকে চুলের মুঠো ধরে নিয়ে আসত গো। সেই গান ভুলে গেলে?

"কেশে ধরে নিয়ে যাবে মিনতি কাহিনী শুনবে না।"

এ তুমি বেচে থেকে ভূতমাহাত্ম্য প্রচার করবে বলেই এমন সমস্ত ভজ্জোত ঝঞ্ঝাট করে খাতির করে তোমাকে আনা হয়েছে গো। তুমি সব দেখে মর্ত্যধামে ফিরে যাও, গিয়ে সেখানে মানুষদিকে সব বল। খবরের কাগজে লেখ।

আমি পুলকিত হলাম। গাটা যে শিরশির করে উঠল। রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে গেল একটু একটু, যেমন নাকি শীতের দিনে হয়। কিন্তু কেমন যেন রোঁয়াগুলি বেশী শক্ত মনে হল। ভাবলাম, এটা কেমন মনে হচ্ছে যে।

সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীভূত বললেন- --তা হবে যে বাঁবা, তাঁ হবে। হাজার হলেও আধা-যমপুরী তো বটে। ঘাটভুবনপুর মানে হল—বৈতরণীর দুপার নিয়ে যে ভুবনপুর এ তো সেই জায়গা হঠাৎ চোখে আঁচল দিয়ে গিন্নীভূত প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, আঃ হায়-হায় রে। মানুষের দুর্মতি দেখ রে। এই সুখের তিন ভুবন উঠিয়ে

দিতে মামলা করেছে মানুষেরা। মামলাতে আমরা হারলে এইটি থাকবে না।

-থাকবে না? কিন্তু বুঝতে না পেরে আমি ওঁর কথাটাই প্রশ্নের সুরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললাম। বললাম থাকবে না?

কি—স্যু থাকবে না। কিস্যু না। তবে আর মামলাটা কিসের বাবা? মামলাটা তো তারই। তাই নিয়ে। স্বর্গ না, নরক না, কিস্যু না। গোলোক বৈকুণ্ঠ না, ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক শিবলোক না বিলকুল না। সব ফু-স্ ধা হয়ে যাবে।

জটা এবার শিবের জটা হয়ে গেল। সে শিবের জটার মধ্যে গঙ্গা যে গঙ্গা সে গোলকধাঁধায় পড়ে পথ হারিয়েছিল পুরাণের বানে। ঠিক মনে হল তাই।

বিশ্বাস হচ্ছে না? না? তা হবারই কথা। তা হলে শুনুন। ধৈর্য ধরে শুনুন। শুনলেই বুঝতে পারবেন। আগে থেকেই ভাববেন না আবোল-তাবোল বকছি।

*　　　*　　　*

বঙ্গদেশের বিখ্যাত বন্দর গ্রামের গিন্নীভূতকে অনুসরণ করছিলাম। সে এক আশ্চর্য দেশ বলুন দেশ লোক বলুন লোক ঝাপসা ঝাপসা কিংবা শীতের দিনের কুয়াশার মত একটা কিছু সমস্ত কিছুকে ঢেকে রেখেছে। তার মধ্যে লোক দেখা যাচ্ছে—এই সাদা কি কালো আবছা মূর্তির মত। তারা চলছে ফিরছে যেন ঠিক পায়ে হেঁটে নয়, তারা পা ফেলে ফেলেই চলছে—তবে মনে হচ্ছে যেন হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে। কথা বলছে ফিসফাস করে। হাসছে। কেউ নাচছে। কেউ ঘুষি পাকাচ্ছে। পায়ের তলার পথ, আগেই বলেছি ঠিক যেন শক্ত মাটির নয়। যেন কালচে রঙের মেঘের মত। পায়ে হেঁটে চলেছি কিন্তু পায়ে যেন মাটি ঠেকছে না।

বন্দরের গিন্নীঠাকরুনের বপুখানি পূর্বেই বলেছি—বিশাল। গিন্নী নিজেই বলেছেন—যখন ভূত হল ২৩।২৪ বছর বয়সে মারা গিয়ে,

তখন তিনি ছিলেন ছিপছিপে লম্বা মত ; ওজন ছিল ৩৭।•৮ সের। এখন বয়স হয়ে মোটা হয়েছেন এবং এখনও দিন দিন মোটা হয়ে চলেছেন। এখন ওজন বিশ পসুরি অর্থাৎ একয়ো সেবে আড়াই মন। তাঁর পা দুখানি প্রায় হাতির বা গণ্ডারের পায়ের মত। সেই পায়ের ধাক্কায় পায়ের তলায় বাতাসময় মাটি বেশ একটু বসে বসে যাচ্ছিল। আর তিনি অনর্গল খোনা গলায় বকছিলেন!

এসে পৌঁছুলাম আমরা একটা জায়গায়। মনে হল যেন কোন একটা বাগান-টাগান হবে। অনেক ফলফুলেব গাছ আছে বলে মনে হল, কিন্তু স্পষ্ট তো দেখা যায় না, ঝাপসা একটা কুয়াশার মত কিছু দিয়ে ঢাকা। গিন্নী সেখানে এসেই বললেন, বাবা এসে গিয়েছি। বাঁচলাম। এই গতর নিয়ে কি হাঁটা চলে? মানুষ হলে হার্টফেল করত। ভাগ্যে মানুষ নই ভূঁত। ভূঁতের হার্ট তো ফেল করে না। এঁখন—দোহাই বাবা ভূতনাথের দোহাই মা ভবানীর, দোহাই যম রাজাব দোহাই গয়েশ্বরীর—যা—যা—যা—যা—কেঁটে যা ধোঁয়াটে ভাব।

আশ্চর্য। দপ করে যেন রোদ উঠে গেল।

দেখলাম—সত্যিই একটা বাগান। চমৎকার বাগান। মাঝখানে একটা চমৎকার সেকেলে চকমিলের বাড়ি। গিন্নী বললেন, বাবা এই হল বন্দরের বাড়িভূত। আমি যেমন মরে ভূত হয়েছি—আমাদের বাড়িটাও ভাঙা হয়ে গিয়ে এখন ভূত হয়েছে।

বলেই বললেন, বাড়িভূত বাড়িভূত—দরজা খোঁলো রে!

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে খোনা আওয়াজ গমগম করে উঠলো—ডাঁকছ, নাম বলো রে।

গিন্নীভূত বলে উঠলেন, মঁর মঁর মঁর অলপ্পেয়ে, চোঁখ রঁয়েছে দেঁখনা চেঁয়ে—

বাড়ি বললে, চোঁখে যে পঁড়েছে ছানি, বয়স তো হালে পায় না পানি! তোমার বিঁয়ের আঁগে আঁমার জন্ম। তাঁছাড়াও স্মঁরণ

কঁর তোঁমার হুঁকুমের মর্ম! দেখদেখি মনে করে, কিংবা দেখ হুকুমনামাখানা পঁড়ে। বল নি কো, ভূতেদের হাজার মায়া, ধরতে পারে আমার কায়া। আমার গলায় কইতে পারে কথা। সুতরাং সাবোধান সাবোধান, ভালো করে যাচিয়ে নেবে। সংকেত বাক্য শুনে তবে খুঁজে দেবে।

গিন্নী বললেন, মর মর মব অলপ্পেয়ে, কাজ নাই কো খেয়ে দেয়ে। বাড় তো তোর কম না! দাঁড় করিয়ে রাখিস দরজার সামনে!

গিন্নী ঠাকরুনের হোক জয়। তবুও 'সংকেত বাক্যের' শেষটুকু বলতে আজ্ঞা হয়। মব মব অলপ্পেয়ে। মর মর মর মর অলপ্পেয়ে, কাজ নাই কো খেয়ে দেয়ে।—তারপর আছে আর এক লাইন। বলল পরেই ফটক আপনা আপনি খুলে যাবে গো হুজুরাইন।

আমি হতভম্ব হয়ে কথা-বিনিময় শুনছিলাম। বেড়ে মিলিয়ে মিলিয়ে ছড়া কেটে কথা বলছে তো!

গিন্নী ঠাকরুন ভূতযোনী—তিনি অন্তর্যামিনী, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাঁবা আমার 'ফাম ফালি চাঁদ' (অর্থাৎ রামকালী, আমার ছদ্মনাম) দেখ দেখি কি ফ্যাসাদ! আইনের প্যাচে পড়ে নিজের বাড়ির বার দুয়ারে, খুঁজে মরছি সংকেত কথার শেষ লাইন। শয়ের ওপর বয়স হল—স্মৃতিশক্তি হারিয়ে গেল। সে লাইনটা মনে নাই—নাই। হায় হায় হায় হায়—কি করি উপায়!

বলতে বলতেই স্থুলকায়া সেই আড়াইমনী গিন্নী ঠাকরুন তড়াক করে, না তড়াক করে নয়, ঢাউসের মত চেহারা তো সুতরাং কোলা ব্যাঙের মত থপথপ শব্দে লাফিয়ে নেচে উঠলেন। এবং একটানে বলে গেলেন, মর মর অলপ্পেয়ে—মর মর মর অলপ্পেয়ে কাজ নাই কো খেয়ে দেয়ে, রেখেছিস ভাঙা ঘরে দুয়ার দিয়ে। শূন্য গোয়াল ভাল দুষ্টু গরুর চেয়ে। খোল দরজা—বন্দর গাঁয়ের বাড়িভূত!

সঙ্গে সঙ্গে দরজা জোড়াটা খুলে গেল। শব্দ হল একটা ক্যাঁচ করে। কবজার শব্দ! বুঝলাম ওটাই সংকেত শব্দ।

*   *   *

বন্দর গ্রামের বিখ্যাত রায় বাড়িটা নাকি তার সদর, অন্দর, ঠাকুরবাড়ি, বাগানবাড়ি, অতিথিশালা, নফরখানা, হাতিশালা, ঘোড়াশালা, গোয়ালবাড়ি, রান্নাবাড়ি তার পরেতে এবাড়ি ওবাড়ি নিয়ে সে এক পেল্লায় বাড়ি ছিল। বাগান ছিল চারদিকে চারটে। পুকুর ছিল চারটে, পুকুরপাড়ে নানান জাতের গাছ ছিল, ফলে-ফুলে মাছে তরকারিতে একেবারে থইথই করত। সেই বাড়ির পুকুর চারটে এখনও বন্দর গাঁয়েই মজা পুকুর হয়ে রয়েছে, বাকী গাছপালা বাগান এবাড়ি ওবাড়ি এশালা ওশালা সব একেবারে চুর করে ভেঙে দিয়েছে। ইট থেকে সুরকি হয়েছে। খালি জায়গায় ফাঁকিবী হয়েছে। এখন বাড়িটা বাড়িভূত হয়ে এসেছে ঘাটভূবনপুরে। সাতমহলা পেল্লায় প্রকাণ্ড বাড়ি কিন্তু খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নাই। আমরা ঢুকেছিলাম কিন্তু একটা ছোট দরজা দিয়ে। বাড়ি ঢুকে বুঝলাম সব খাঁ খাঁ করছে। দরজায় দ্বারবান নাই—ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুর নাই—নফরখানায় ঝি চাকর নাই—হাতিশালায় হাতি নাই—ঘোড়াশালায় ঘোড়া, গোশালায় গরু কিস্যু নাই। বাড়িতে ধুলো জমেছে, ছাদের কড়িতে ঘরের কোণে কোণে ঝুল পড়েছে, কেমন যেন ভ্যাপসা গন্ধ উঠেছে, শুধু দেখলাম একটা সুড়ঙ্গের মত পথে শাহী-শাঠী জোয়ান ভূত যাওয়া-আসা করছে। তাদের পাগুলো থামের মত, হাতগুলো কাঠের খুঁটির মত, বুকের পাটা বাটনাবাটা পাথরের শিলের মত এবং হাতের মুঠোগুলো এক একখানা দশ সেরী নোড়ার মত। তাদের মুখগুলো ঠিক ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। তবে গোল গোল ভাঁটার মত চোখ আর মুখ থেকে দুটো রসুন বা পেঁয়াজের কোয়ার মত দাঁত বেরিয়ে আছে ঠোঁটের উপর, তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল। তারা মাথায় করে বড় বড়

ঝুড়ি বয়ে বয়ে আনছিল এবং আবার যাচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল এদের পা হাতের চেটোগুলো যেন উলটো দিকে।

ঠাকুরুন বললেন, পিণ্ডি যা মর্ত্যলোকে পড়ছে, তাই ওরা বয়ে আনছে বাবা। ওরা সব জন্মগত। গয়েশ্বরী ঠাকরুনের চ্যালা চামুণ্ডা।

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, ওরা এ ওর পিঠ চাটছে, মুখ চাটছে কেন?

ভূতগুলো তাদের লম্বা লম্বা জিভ বের করে পরস্পর গা চাটছিল, সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। এই কালো কালো দশাসই ভূত তাদের বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীজের মত লম্বা লকলকে জিভ বের করে পরস্পরের পিঠ চাটছিল এবং নিজের নিজের গা১,ল চেটে খাচ্ছিল যেন মধুটধু খাচ্ছে।

গিন্নী বললেন, হ্যাঁ বাবা তাই বটে। মধু পায়েস চিনি দুধ এসব তো পিণ্ডিতে পড়েছে, সেইগুলোর রস ঝুড়ির ফাঁক দিয়ে নীচে নেমে ওদের মাথায় মুখে পিঠে গড়িয়ে নেমে এসেছে। তাই এ ওর পিঠ চাটছে। ওরা তো খুব লোভী হয়। ওই লোভের জন্যেই ওরা আছে এখনও কাজকর্ম করছে। না হলে সব 'ফুস—ধা—' হয়ে যেতো। কিস্যু থাকত না কিস্যু থাকত না! বাইরে তো ঘাটভুবনপুর—যমভুবনপুর নরকভুবনপুর স্বর্গভুবনপুর সে তোমার ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক শিবলোক ইন্দ্রলোক সব জায়গা জুড়ে হাঙ্গামা লেগে গেছে। তাই দেখাতে তো তোমাকে এমন তাড়াতাড়ি করে এনেছি। তুমি সব দেখে যাও, গিয়ে মর্ত্যলোকে এই 'ফুস ধা' বিপ্লবের কথা ফলাও করে লিখে সকলকে জানিয়ে দিয়ো। নাম দিয়ো বরং "ফুস ধা সংগ্রাম।"

আমার কানে কথাগুলি আসছিল, কিন্তু সে-সবের প্রতি আমার মন এতটুকু আকৃষ্ট হচ্ছিল না। আমি দেখছিলাম সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ভুতেরা লম্বা সাপের মত জিভ বের করে করে পরস্পরের গা

চেটে চেটে খাচ্ছে। এবং তিড়িক তিড়িক ভঙ্গিতে অর্থাৎ খুব প্রকাণ্ড গঙ্গাফড়িংএব মত। কল্পনা কর—পাঁচ ছ হাত লম্বা এক একটা গঙ্গাফড়িংএব মত চেহারা তাদের, ঘোর কালো রং আর ড্যাবা ড্যাবা চোখ—লম্বা এবং সরু কাঠির মত হাত পা, এমনই একদল বিচিত্র জীব পরমানন্দে নাচছে।

গিন্নী বললেন, জানো বাবা, এরা খুব ভালো ভূত। এরা মানুষ মরে ভূত নয়, এরা জন্ম থেকে ভূত। মানে আসল ভূত। বিধেতা দেবতা মানুষ জন্তুজানোয়াব তৈরী করতে করতে হঠাৎ একদিন কিম্ভুতকিমাকার এই গঙ্গাফড়িংয়েব মত কি তৈরী করলেন। বললেন তোরা ভূত। তোরা জন্মালি তোরা মরবি না। দেবতাদের মতই তোরা অমর হলি। তবে মধ্যে মধ্যে প্রমোশন হবে। মানে দেবতাদের ঠিক নীচেই অপদেবতা উপদেবতা হয়ে যাবি। তখন মানুষেরা তোদের পূজো করবে। যেমন ভোলাঠাকুর পেঁচোঠাকুর শিবঠাকুব। পূজো নিবি! লোকেব ঘাড়ে চাপবি। তা বাবা মোটামুটি এরা ভূত ভাল। এরা 'ফুস ধা' সংগ্রামে টংগ্রামে নাই।

হঠাৎ কোথা থেকে যেন খোনাটে বাজখাই গলায়, আমাদের সাধু ভাষায় বজ্রনির্ঘোষের মত ঘোষণা করলেন—

ঘাঁটিভুঁবনপুঁরের ভুঁতেরা জঁম্মে থেকে ভুঁত, নিরেট ভুঁত, এবং আঁপাদমস্তক ভুঁত। তাঁরা বোকা তারা বঁদ্ধু—তারা ভুঁত। যখন মানুষভূতের সঙ্গে জন্তুভুতেরা নিরন্তর সংগ্রাম করছে দেবতাদের সঙ্গে সমান অধিকার লাভের জন্য তখন ঘাটিভুবনপুরের জন্মভুতেরা এখনও দেবতাদের সঙ্গে রয়েছে—তাদের হুকুমে চলছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিপ্লব ঘোষণা করছি। আমরা বলছি এখন থেকে আমাদের শ্লোগান হল—জঁন্মভুঁতেরা—

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড কলরবে ধ্বনি উঠল—মুদাবাদ!

আবার ধ্বনি উঠল—অপদেবতারা—মুদাবাদ।

আবার উঠল—উপদেবতারা—মুদাবাদ!

আবাব উঠল—দেবতাবা—মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ তিনবাব মুর্দাবাদ!

তাবপব উঠল—মবে মানুষভূতেবা—মুর্দাবাদ।

সঙ্গে সঙ্গে—যে শ্লোগান দেওযাচ্ছিল বললে—না—না—না—। হল না।

—বল—জিন্দাবাদ। বল—মবে মানুষভূতেবা—জিন্দাবাদ। বল—মবে জন্তুভূতেবা—জিন্দাবাদ।

সঙ্গে সঙ্গে আব কেও বলে উঠল না—না—না। মুর্দাবাদ সব মুর্দাবাদ।

এবাব প্রথম বক্তা বললে—সবাই মুর্দাবাদ তো জিন্দাবাদ কে? দ্বিতীয় বক্তা বললে—'ফু—স ধা'—জিন্দাবাদ।

—'ফুস ধা'—জিন্দাবাদ?

—হ্যা ফুস ধা, জিন্দাবাদ।

—'ফুস ধা' টা কি তাই বল?

মানে কিছুই না। বেলুনেব ভেতবেব বাতাসেব মত যা ফুস কবে বেবিয়ে যায় তাই—

—তাহলে ফটাস শব্দ কবে যে-সব বেলুন ফাটে?

—তাও জিন্দাবাদ।

—তা হলে? হলটা কি—

—ফুস ধা জিন্দাবাদ, ফটাস ফুস জিন্দাবাদ। ভূত নাই জিন্দাবাদ, দেবতা নাই জিন্দাবাদ, অপদেবতা নাই জিন্দাবাদ। ফুস—ফুস ফট ফটাস ফট জিন্দাবাদ।

আমি হতভম্ব হযে গিয়েছিলাম। মুখখানা হাঁ হয়ে গিয়েছিল। আমার সামনে বন্দবেব গিন্নী ঠাককনও অনেকটা হতভম্ব হয়েই দাঁড়িয়ে অকাবণে গা চুলকুচ্ছিলেন—মাথাব ঝাঁকড়া চুলগুলি চুলকচ্ছিলেন—মধ্যে মধ্যে এ হাতেব নখ দিয়ে ও হাতের ঘামাচি মারছিলেন—পুট পুট করে শব্দ হচ্ছিল। মুখে বলছিলেন—ছি—ছি—ছি—মা গো! একেবাবে অবাজক হয়ে গেল গো। আইন নাই

কানুন নাই রাজা নাই মন্ত্রী নাই কোটাল নাই —সব মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ করে ফু দিয়ে উড়িয়ে দিলে গো !

জিজ্ঞাসা করলাম—" লোক দুটো কে ? যারা ঐরকম চেঁচাচ্ছে ?

—প্রথম জনা একজন মুনি গো। এই নাভিকুণ্ডল পর্যন্ত দাড়ি, এই গোঁফ, মাথায় টাক। খুব তেজী লোক। যে বলেছিল মরা গরুতে ঘাসও খায় না কথাও বলে না। মিছে পিণ্ডিতে ঘি মধু খরচ কর। তার চেয়ে ঋণ করে ঘি খাও নিত্যি গরম গরম ভাতের সঙ্গে —নিজের পয়সায় কিনে খেয়ো না। দোকানে খাতা করো সেই খাতায় লিখিয়ে ঘি খেতে খেতে মরে যেয়ো. দেনার জন্যে ভেবো না। স্বর্গও নাই নরকও নাই। নরকেও যেতে হবে না, জন্মান্তরে সুদ সমেত ঋণ শোধও করতে হবে না।

বুঝলাম এই মুনি বা ঋষি যার কথা বলছেন গিন্নীভূত—তিনি চার্বাক ছাড়া আর কেউ নন।

ভূতগিন্নী বললেন আর একজন হল বাবা সেও একজনা কে বটে—তারও নাম আমি জানি না। তার তেজ আরও বেশী। সে ওই ফুস—ধা দলের পাণ্ডা। লীডার না কি বল তোমরা। তাছাড়া বাবা—ভূত মানে মরে-ভূত, মানুষভূত জন্তুভূতের তো লেকা-জোকা নাই বাবা। সব এসে আজ জমেছে। আজ বিধাতার বিধান পরিষদে তুমুল ব্যাপার। তাই দেখাতে তোমাকে এনেছি। এ তোমাকে লিকে রাখতে হবে। তোমাকে লিকে রাখতে হবে। তোমাকে গত দুবছর দুবার কিছু কিছু দেখিয়েছি। তুমি ভূত মান। তুমি দরদ দিয়ে লিকবে। বাবা তোমরা মানুষ—এখনও মর নাই —তোমাদের কথা তো তুমি জান, আমরা মরে ভুত হয়েছি, আমাদের কথা তোমরা জান না, আমাদের তোমরা মান না মানতে চাও না। তাই সব জানাবার জন্যে এনেছি তোমাকে। তুমি সব স্বচক্ষে দেখ।

বলতে বলতেই সামনের দিকে একটা দরজা খুলে গেল।

দরজাটা প্রকাণ্ড বড় দরজা। দরজার ওপাশে বারান্দা। বারান্দার

ওপাশে বিশাল ভূখণ্ড। সে ভূখণ্ডের উত্তরে উত্তরমহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণমহাসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমমহাসাগর, পূর্বে পূর্বমহাসাগর বেষ্টিত এলাকার চেয়েও যেন বড় মনে হল! আর সেখান থেকে কি প্রচণ্ড কলরবই না উঠছে!

মনে হল আকাশে প্রলয়ের মেঘ ডাকছে, সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, তরঙ্গ উঠেছে, মাটির তলায় ভূমিকম্প হচ্ছে—আরও—আরও অনেক কিছু হচ্ছে!

সমস্ত কলকাতার ছেলেরা মিলে ক্যানেস্তারা পিটছে এবং তার সঙ্গে যত শিঙে আছে কলকাতায়—সব শিঙেগুলো একসঙ্গে বাজছে।

তবে বাজনা নয়? ক্যানেস্তারা বাদ্যিও নয় শিঙের আওয়াজও নয়—এ হল চিৎকার···সে একেবারে কোটী কোটী মানুষ···সব যেন কিলবিল করছে। কোন একটা কিছু পচলে তার মধ্যে যেমন দিনকয়েকের মধ্যে পোকা জন্মে থিকথিক করে, তেমনিভাবে ওই বাগানটার মধ্যে থিকথিক করছে মানুষেরা।

না, মানুষেরা নয়। মরা মানুষেরা—অর্থাৎ মানুষমরা ভূতেরা।

গিন্নী ঠাকরুনই বললেন—এরা হল মরে-ভূত হওয়া ভূত বাবা। জন্মভূত মানে আসল ভূতেদের পায়ের হাতের চেটো উলটো দিকে—আর কালো কালো রং। আর এরা মরে ভূতেরা—মানে পেত্নীরা ব্রহ্মদত্যিরা দেখতে সব মানুষেরই মত। শুধু হরেকরকম চেহারা ধরে। ইচ্ছেমত ছোট বড় হতে পারে। আর ওই পাশে দেখ—ওই দূরে যত সব জন্তুভূতেরা কিলবিল করছে।

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—জন্তুভূত?

—হ্যাঁ গো! জন্তুভূত। বাঘ, সিংহী, ভালুক, গণ্ডার, হাতি, বাইসন, নেকড়ে বাঘ, উল্লুক, বাঁদর এমনকি ছুঁচো পর্যন্ত মানে যত জন্তু পৃথিবীতে আছে আমাদের এদেশে আছে তারা সব জড়ো হয়েছে। ওই দেখ সব চিৎকার করছে। তারাও তো মরে বাবা। মরে তারাই বা যাবে কোথায়? জায়গা সেই এক স্বর্গ নরক।

শুনতে পেলাম, কানে আসছিল, বাঘেরা করছে—গাঁক—গাঁক। সিংহী করছে আঁ—ক আঁক। ভালুক করছে—হুঁকো হুঁকো। গণ্ডার করছে—আঁ—আঃ। হাতি চেঁচাচ্ছে—আঁক—আঁক। উল্লুক চেঁচাচ্ছে—হুলু লুলু লুলু। শেয়ালগুলো করছে—খ্যাক খ্যাক। হনুমান করছে হুপ হুপ। সব প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে এ ভাবেই কোরাস।

—কেন? চেঁচাচ্ছে কেন? শুধুই চেঁচাচ্ছে? না কিছু বলছে?

—বলছে মানব না, কিছু মানব না।—দে ভেঙে, কিচ্ছু রাখব না।

বাঁ হাতের তালু দিয়ে বাঁ কানটা খুব জোরে টিপে ধরে যাকে সাধু ভাষায় বলে গভীর এবং তীক্ষ্ণ অভিনিবেশ সহকারে মনঃসংযোগ করে ডান কানটা পেতে শুনলাম এবার। ডান দিকেই ওই মানুষভূত এবং জন্তুভূতের জনতাটা জমেছিল। শুনলাম মনে হল সারা পৃথিবীর ব্যাণ্ডমাস্টারেরা নিজেদের ব্যাণ্ডপার্টি এনে ভোঃ-পোঃ ভোঃ-পোঃ বাজনা বাজাচ্ছে। তা থেকে সত্যিই ওই শ্লোগান উঠছে—মানব না—কিছু মানব না দে ভেঙে, কিচ্ছু রাখব না।

হঠাৎ বাজনা থামল—হোঁ ক্যো হ্যোঁ ক্যো—হোয়া হোয়া হোয়া আওয়াজে কেউ বললে—বিচার।

সমস্বরে ধ্বনি উঠল—চাই।

আওয়াজটা চেনা চেনা মনে হল। মানে আওয়াজটা যে কোন গাধার এটা যে কোন লোক শুনেই বুঝতে পারবে। তা নয়, চেনা বলতে আমি বলছি যে, যেন কোন চেনা গাধার আওয়াজ মনে হল।

মনে মনে স্মরণ করবার চেষ্টা করেও ঠাওর করতে পারলাম না—কোন গাধার সঙ্গে আমার চেনা-শোনা ছিল। অথচ মনে হচ্ছে আওয়াজটা খুব চেনা।

আমি ভেবে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম।

গিন্নী ঠাকরুন বললেন—দাঁড়িয়ে যে বাঁবা!

বললাম—ভাবছি মা। আওয়াজটা যেন চেনা মনে হচ্ছে।

গাধাটা আবার চিৎকার করে উঠল—হুকুম বিচারক !

একটা গম্ভীর আওয়াজ উঠল—বল।

—হুঁজুর আমি একজন মানুষ সাক্ষী পেয়েছি !—তাকে সমন ধরানো হোক !

গিন্নীভূত বললেন, "ও বাবা, তোমার দিকেই যে আসে গো। তোমার কথাই বলছে যে ওই দ্যা-খো !" তিনি একটু বাঁ পাশ দিয়ে আঙুল দেখালেন। দেখলাম, একটা গাধা বিচিত্র ভঙ্গিতে মানে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে সামনের পাদুটো এবং মাথাটাকে নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে খটখট শব্দে হেঁটে মানুষের মত চলে আসছে। আবার সামনে এসেই সে তার ডান হাত অর্থাৎ সামনের ডান পাটা প্রায় নাকের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—এই এই লোকটা। নাম ফামফালীবাবু। মানে দশরথের বড় বেটা আর শিবের বুকের উপর নাচেন যিনি তিনি, দুইনাম জুড়ে নামটা ! ইনিও আমার সাক্ষী ! আবার আসামীও বটেন। ওর কাচা জামা কাপড় আমি পিঠে বয়ে এনেছি।

আমি চার পা পিছিয়ে গিয়ে বললাম—তুমি কে ? মানুষের মত খাড়া হয়ে দাঁড়ানো গাধাটা দুপা এগিয়ে এসে বললে—চিনতে পারছ না। তা পারবে কেন ? কিন্তু একে চেন ?

বলেই সে তার বাঁ-হাত বা সামনের বাঁ-পায়ের খুরে জড়ানো একটা দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে—ইধর আও—আবে দুর্যোধনোয়া। আও—।

বলতে বলতে টেনে হিঁচড়ে হাজির করলে একটা মানুষকে। মানুষটার গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে আনলে। লোকটা মানুষ কিন্তু চতুষ্পদের মত হাত পা মাটিতে পেতে হাঁটছে।

লোকটা আমায় দেখে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে। দেখুন বাবু আমার দুঃখু দেখুন। আপনাদের জামা কাপড় কেচে ওর পিঠে চাপিয়েছি, তার শাস্তি দেখুন !

ও—মা! আমি অবাক্ হয়ে গেলাম! এ যে আমাদের দুর্যোধন রজক। পশ্চিমী হিন্দুস্থানী রজক, আমাদের দেশী বাঙালী রজক নয়। আমার টালার বাড়ির সামনে একটা পুকুর ছিল সেই পুকুরে কাপড় কাচত আমাদের বাড়িরও কাপড় কাচত লোকটা। তিন চারটে গাধা ছিল, তার মধ্যে এটা সেই বড়টা। এটাই বেশ চ্যাচাতো হোঁকো হোঁকো শব্দে। এবং দুর্যোধন দমাদম বাঁশ দিয়ে পিটত।

আমি বললাম—দুর্যোধন তুমি এখানে?

দুর্যোধন বললে—বাবু আমি সাতদিন আগে মরেছি, মরে এখানে এসে ওই জিন্দাবাদী দলে ভিড়েছিলাম—সেখানে একদিন খুব চেঁচাচ্ছিলাম হঠাৎ আমার মরা গাধাটা এসে আমাকে পাকড়াও করলে। তারপর গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধলে। এখন ও আমার পিঠে বোঝা চাপিয়ে খাটাবে আর পিটবে এই দাবিতে নালিশ করেছে। আমার গলায় দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

—সর্বনাশ!

গাধাটা হোঁকো হোঁকো শব্দে ক্রুদ্ধ গর্জন করে বললে—সেই একদিনের লাঠির বাড়ি আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। বাপরে বাপরে বাপরে শব্দে যত কাতরাচ্ছি তত ও মেরেছে আমাকে। এই বাবু তার সাক্ষী।

আমার মনে পড়ে গেল। ব্যাপারটা নির্ভেজাল সত্যি। এতটুকু বাড়িয়ে বলছে না গাধাটা। অথচ ব্যাপারটায় গাধাটার দোষ বিশেষ ছিল না। সে হয়েছিল একদিন—সেদিন দুর্যোধন প্রচুর পরিমাণে মদ খেয়ে একেবারে অজ্ঞানের মত বাড়ির সামনে পড়েছিল। সামনে ছিল কিছু খাবার আর দুর্যোধনের বমি করা বমি। একটা কুকুর দুর্যোধনের মুখ চাটছিল, সেই দেখে গাধাটা হোঁকো হোঁকো হোঁকো অর্থাৎ ভাগো ভাগো বলে কুকুরটাকে তেড়ে এসেছিল। কুকুরটা পালিয়েছিল, কিন্তু নেশার ঘুম ভেঙে দুর্যোধন খুব চটে গিয়ে একখানা

াশের লাঠি নিয়ে গাধাটাকে পিটে ঢিট করে দিয়েছিল। আমিই িরস্ত করেছিলাম সেদিন দুর্যোধনকে।

গাধাটা বললে—বল বাবু সত্যি কথা বলো—সাক্ষী দাও ভগবানের আদালতে। এখানে মিথ্যে বললে---

কি হত আমার জানি না বা কি করতাম আমি জানি না, তবে াচালেন আমাকে গিন্নী ঠাকরুন। তিনি ডাকলেন ও মকদ্দমা নরেস্তার নায়েব। ও গুপী মিত্তির!

এর মধ্যে কখন যে গিন্নীর পেছনে একদল কর্মচারী এসে চুপ রে আবির্ভূত হয়েছে তা জানতে পারিনি। পিছন থেকে এগিয়ে ল একেবারে সাঁতরাগাছির ওলের মত টাকালো অর্থাৎ টাকযুক্ত াথাওয়ালা এবং গোঁফ-দাড়ি কামানো চাঁচাছোলা মুখ গুপী মিত্তির। গুপীকেও আমি চিনি। সে তার নধর ভুঁড়িটি নিয়ে এগিয়ে এসে লেল—বিবেচনা করুন গিন্নীমা আমি এইখানেই আছি। হুকুম করুন অধম ভৃত্যকে।

—গাধাটা যে ফামফালীকে সাক্ষীর সমন ধরাচ্ছে গো। আটকে গলে তো চলবে না। সবতো দেখতে হবে ওকে।—না, কি বলছ? া।

—বিবেচনা করুন আমি দরখাস্ত দিয়ে আপত্তি দিচ্ছি—ওকে াক্ষীর সমন ধরানো এখন চলবে না।

—গাধা গর্জে উঠল—চলবে না মানে?

—ওহে গর্দভচন্দ্র, মানে সোজা। বুঝলে? বিবেচনা কর উনি এখনও পাকাপাকি ভাবে মরেননি। অর্থাৎ এখনও এখানকার লাকই নন। সব দেখে শুনে ওঁকে ফেরত যেতে হবে। উনি সাক্ষী দিতে আটকে থাকলে ওঁকে মরতে হবে। যমপুরীতে জ্যান্ত লোকের াক্ষী চলে না।

বাস। গাধাটা থ মেরে চুপ হয়ে গেল। এর আর জবাব খুঁজে পলে না। গিন্নী বললেন—চল বাবা। এগিয়ে চল। অনেক দেখতে

হবে। গোপী তুমি যেন সঙ্গে থেকো।

—বিবেচনা করুন। অধীন ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আছে। কোনো চিন্তা নাই। চিন্তা যা তা ওই বিধান শালায়। বড়ই হাঙ্গামা সেখানে।

প্রশ্ন করলাম—সেখানে হাঙ্গামা কিসেব?

—স্বচক্ষে দেখবেন। স্বকর্ণে শুনবেন। তারই জন্য তো বিবেচনা করুন মহাশয়কে আনয়ন করা। জীবন থাকতে তো যমলোকে আনার নিয়ম নাই। মহাশয়কে ইস্পিশাল প্রিভিলেজ দিয়ে আনা হয়েছে।

হঠাৎ হে-রে রে-রে শব্দে ম্যা-ম্যা আওয়াজে সে প্রায় 'যুদ্ধং দেহি' রব তুলে পিছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটো হাতের মত তুলে সেই হাতের ডান হাতে কেউ দা কেউ খাঁড়া কেউ বগি দা তুলে ছুটে এগিয়ে এল; একদল ছাগল—দেশী ছাগল, রাম ছাগল, ভেড়া, সে প্রায় এক ব্যাটেলিয়ন হবে। সবার হাতে খাঁড়া, সবাই পিছনের পায়ে ভর দিয়ে মানুষের মত দাঁড়িয়ে খটখট করে হেঁটে চলে আসছিল।

গুপী মিত্তির এগিয়ে গিয়ে বললে ফামফালীবাবু কোন কসাই নন। উনি পাঁঠার মাংস অবশ্যই খেয়েছেন—কিন্তু পাঁঠা কখনও নিজে কাটেননি। এবং যে সব পাঁঠার মাংস খেয়েছেন তারা তোমরা নও। বিবেচনা কর—কাজে কাজেই তোমাদের দায়ের কোপ উনি খাবেন না। পথ ছাড়। দাগুলো নামাও। কোথায় কারও খোঁচা লাগবে। বুয়েচ!

মিত্তিরের কথায় ছাগলগুলো পথ ছাড়তো কিনা বলতে পারি না, তবে এই সময় একটু দূরে হঠাৎ শব্দ উঠল—হামবা-হামবা-হামবা।

ছাগল ভেড়ারা চকিত হয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললে—জমিতে চাষ দিচ্ছে! জমি থেকে সরে চল। পতিত জমি চাষ হচ্ছে। সরো সরো।

আর একজন বললে—ওই দিকে চল। ওই দিকে চল। ওই দেখ—গয়েশ্বরীর পেয়াদারা একদল মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ও লোকগুলোর মধ্যে নিশ্চয় কেউ কসাই থাকবে বা ছেত্তাদার থাকবে! চল—চল। অন্ততঃ পাঁঠা কেটে খেয়েছে এমন বাবুভাইও থাকবে। চল-চল।

ছাগলের সব দল উদ্যত খাঁড়া, তলোয়ার, ছোরা, রাম দা, বগি দা হাতে মুহূর্তে ডানহাতি ঘুরে যে দিকটায় মানুষেরা কিলবিল করে ছুটোছুটি করছিল সেইদিকে চলে গেল। সামনে পড়ে রইল দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একখানা মাঠ! হয়তো বা হাজার পাঁচ হাজার বিঘের একখানা মাঠ। একেবারে এপ্রান্তে ঝাপসা গাছপালা দেখা যাচ্ছে। ওই দিক থেকেই গরু মোষের গলার মিশানো আওয়াজ উঠছে—এঁ্যা —ব্যা। এঁ্যা—ব্যা। হামবা—হামবা।

গিন্নী ঠাকরুন বললেন—দেখ দেখ একখানা হাল কি জোরে আসছে দেখ। দেখেছ? ও মা! ও যে—দাঁড়াও দাঁড়াও বলে গো।

আমি দেখলাম সে এক অদ্ভুত অভাবনীয় কাণ্ড। সে দৃশ্য এক আশ্চর্য এবং বিচিত্র দৃশ্য। দেখলাম পাশাপাশি আটদশখানা হাল চলে আসছে, তাদের পেছনে আসছে আবার হয়তো বা বিশখানা হয়তো বা আরও বেশী। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপারত্ব কি কাণ্ডকারখানার অভাবনীয়ত্ব যাই বলা যাক সেটা সেখানে নয়, সে অভাবনীয়ত্ব ও অদ্ভুতত্ব হল অন্যত্র! মানে ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখলাম—হালগুলো গরুতে টানছে না, টানছে মানুষে। দুপাশে দুটো বলদের বদলে দুটো মানুষের কাঁধ শক্ত দড়ি দিয়ে মজবুত ভাবে বেঁধে জুতে দেওয়া হয়েছে এবং পিছনে যে হালখানা চালাচ্ছে সে মানুষ নয়—সে হল মানুষের বদলে একটা বলদ। বলদটা দুই পিছনের পায়ে খুর দিয়ে দিয়ে বাখারির পাঁচখানা তুলে হামবা হামবা রবে হেট্ হেট্ হেট্ শব্দে পরমোল্লাসে এগিয়ে আসছে এবং সেই উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে

তালে তালে তার লেজখানা আন্দোলিত হচ্ছে। পাশে পাশে আসছে আর একটা বলদ। সেটাও ওই পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষের মত হেঁটে হেঁটেই আসছে পরমানন্দে! আর ডাবা হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে হাম্বা স্বরের মধ্যে যতখানি সুর আছে তাই দিয়ে গান গাইছে ঃ

"নাইরে নাইরে নাইরে
ভূঁত জন্মের মতন সুখের জন্ম কোথা পাইরে!
গরু হয়ে জন্মেছিলাম, কাঁধে জোঁয়াল বয়েছিলাম
ভূত হয়ে তার শোধ তুলিলাম—শোধ তুলিলাম রে!
সতীশচন্দ্রের পিঠের উপর পাঁচন বাড়ি চালাই রে!"

বলেই সে সতীশ নামক জোয়ালে জোতা মানুষটার পিঠে পাঁচনের এক বাড়ি কষিয়ে দিয়ে নাকে শব্দ করে উঠল—ঘঁড়্ ড়ড়্ ড়ড়্ হেৎ ত্যা ত্যা ত্যা। বেকুব বেহদ্দ মানুষ কাঁহাকা—হেট-হেট।

সতীশ বলে যে মানুষটা ডান দিকে জোয়াল টানছিল—সে তার পিঠটা টান করে ঘাড়সুদ্ধ মাথাটা দিয়ে ঠেলছিল—আমাকে দেখে লাঙ্গল টানতে টানতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে—বাপ মশায়। আপুনি কবে এলেন মশায়? তারপরই কাঁদো কাঁদো হয়ে গিয়ে বললে—দেখুন কেলে বলদ আমাকে কি পেকার পেহার করছে দেখুন। পেরাণ-পণ করে টানছি তবু বলে টানছে না! পাঁচনখানা মেরে মেরে পিঠে ঘেঁটা পরিয়ে দিলে। আপনি সাক্ষী থান—মশায়—বলুন—আমি এমন করে মারতাম কেলেকে?

লাঙল চালিয়ে কেলে, অর্থাৎ কালিচন্দ্র বলদ ও লাঙল টানিয়ে সতীশচন্দ্র মানুষ এবং আর একজন মানুষ যার নাকি মর্ত্যধামে নাম ছিল পাগল চন্দ্র, এ তুজনই আমার চেনা। আমাদের গ্রামের সত্যবাবুদের বাড়িতে খুব ভাল চাষের ব্যবস্থা: তিনখানা হাল আছে। আগে চারখানা ছিল। কেলে বলদ তাদের বাড়িতেই বলদ এবং সতীশ পাগল তাদের বাড়িরই কুষাণ ছিল। তারা মারা গেছে

তা অনেক দিন হবে।

লাঙল চালক কেলে বলদ তার পাঁচনবাড়ি ধরা হাত বা পা খানা ভয়ংকর রকমভাবে আস্ফালন করে বললে, পিঠের চামড়া তুলে দেব সতে,—নাকে কাঁদলে শুনব না। চলবে চল। বলে লম্বা হাত বা পা খানা বাড়িয়ে সতীশের কান মুচড়ে দিয়ে বললে ও ভাই আট-কেলে! আটকেলে হল সেই যার গায়ে আটটা বা তার থেকে বেশীসংখ্যক কালো কালো দাগ। এবং সেটা হল ওই আর একটা বলদ যেটা তামাক খাচ্ছিল এবং গান গাচ্ছিল—

তাইরে—নাইরে—নাইরে!

আটকেলে বললে—তামাক খাবি নাকি রে কেলে?

শিঙসুদ্ধ মাথা নেড়ে কেলে বললে —উঁহু।

আটকেলে বললে—তবে?

—আমাদের লীডারকে বলতে হবে একটা পেয়েণ্টোর কথা। সেটা হল মানুষকে যখন হালে জোড়া হবে তখন একটা করে লেজ জুড়ে দিতে হয়ে পিছনে। শা—; কান মুচড়ে কখন লেজ মোচড়ানোর সুখ হয়? সতের কান দুটোর একটা ডেলা পাকিয়ে গিয়েছে। একটা ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলছে, এখন মোচড় দি কি করে বল?

বলতে বলতে হালবাহী বিরাট দলটি সামনেব দিকে চলে গেল। মানে ওই ঝাপসা দিগন্তের দিকে।

এমন সময় কাঁসর ঘণ্টা কাড়া নাকাড়া বেজে উঠল। তার সঙ্গে সে এক আকাশ বিদারী চিৎকার—জিন্দাবাদ!

সে মুহুর্মুহুঃ জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!

বন্দরবাড়ির গিন্নীভূতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—ওখানে আবার কি!

গিন্নী ঠকুরুন তার আগেই বললেন গোপী মিত্তিরকে—বল না গো মিত্তিরের পো!

সঙ্গে সঙ্গে মিত্তির বললে—আপনাকে এখনও পর্যন্ত বুঝি কিছু বলে নি! জয় ভূতনাথ হে! সাধে কি আর তোমার রাজ্য টলমল বাবা! হায় হায় এত পরিমাণে গাঁজা ভাঙ আফিং ধতুরা একসঙ্গে টানলে কি আর বোধ বুদ্ধি থাকে না রাজ্যপাট চলে! বাবুমশায় বিধিবিধান পরিষদের রাজা সুরথ পরিণাম বিলের একটা নতুন ধারা যোগ হচ্ছে তার নাম শোধবোধ ধারা। সে আপনার বিবেচনা করুন ভীষণ ভয়ংকর বিপ্লবাত্মক ব্যাপার! তাই পরিষদ ভবনের বাইরে মানুষ আর জন্তুরা সব মিছিল করে এসে জিন্দাবাদ চালাচ্ছে।

এবার স্পষ্ট কানে এল- সুরথ পরিণাম বিল—

—জিন্দাবাদ!

—নয়া শোধবোধ ধারা—

—জিন্দাবাদ!

মাথাটা ঘুরতে লাগল; সুরথ পরিণাম বিল? কি কাণ্ড! এ যে সেই সত্য যুগের ব্যাপার, চণ্ডীতে আছে! সুরথ নামো রাজাভূৎ সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ সেই সুরথ রাজার নামেই বিল বটে।

রাজা সুরথ চণ্ডী মাহাত্ম্য শুনে দুর্গাপূজা করেছিলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পূজার ফলে—মা দুর্গা দেখা দিয়ে তাঁকে বর দিয়েছিলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দিয়েছিলেন। বিবেচনা করুন একলক্ষ বলি দিয়েছিলেন তিনি চণ্ডীর পুজোতে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি বটে।

—হ্যাঁ; বিবেচনা করুন স্বর্গে তিনি যখন এলেন তখন দেবতারা তো ভয়ানক চটে গেল। মা দুর্গার বর পেয়েছে, মা দুর্গা সাক্ষাৎ হয়ে দর্শন দিয়েছেন সে লোকটা স্বর্গে এসেছে, এখন তার জন্যে একটা পদ তো দিতে হবে। বড়দের মানে ব্রহ্মা বিষ্ণুদের তো কিছু যাবে না, যেতে যাবে অন্যদেবতাদের। তখন তারা ওই একলক্ষ ছাগল

ভেড়া মহিষের কবন্ধ আর মুণ্ডকে ডেকে এনে বললে—চ্যাঁচা বেটারা চ্যাঁচা। তারা জিজ্ঞাসা করলে কি বলে চ্যাঁচাবো। দেবতারা বললে এর মধ্যে থেকে কূটবুদ্ধি হল শনিঠাকুরের, বললে চ্যাঁচা যা বলে হোক চ্যাঁচা। বিচার চাই বলে চ্যাঁচা! তা হলেই হবে! তাই চ্যাঁচাতে লাগলো একলক্ষ ছাগল ভেড়া মোষ। বিচার চাই।

—চাই বিচার চাই।

—সূক্ষ্ম বিচার চাই!

—একলক্ষ ছাগল ভেড়ার সে চীৎকারে স্বর্গের বিধিরবিধানালয় কাঁপতে লাগল। স্বর্গে ইন্দ্ররাজা অপ্সরাদের নাচ দেখছিলেন—দেবতাটি চমকে উঠে লাফিয়ে প্রশ্ন করলেন—কোন দৈত্য এল আবার?

অপ্সরারা নাচ ভেঙে দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে পালাল নন্দনবনের পুকুরটার পাড়ের উপর দিয়ে।

চন্দ্রঠাকুর সাঁ করে আকাশে উঠে ছুটলেন কৈলাসের দিকে বাবা শিবের জটার মধ্যে লুকুবেন।

বায়ুঠাকুর ঝড়ের বেগে একেবারে পালালেন সাতসমুদ্র তের নদীর পারে! ইন্দ্ররাজা পালাতে গিয়ে ডান পায়ে হুঁচোট খেয়ে বুড়ো আঙুলের নখ উঠিয়ে ফেলে বসে থরথর করে কাঁপছেন, এমন সময় একজন ভূত এসে বললে—দৈত্য নয়, ছাগল ভেড়া মোষ।

সবিস্ময়ে ইন্দ্র বললেন—ছাগল ভেড়া মোষ? তারা কি চায়—

—বিচার চায়।

—কিসের বিচার?

—তাদের কেটেছে মর্ত্যধামে সুরথ রাজা। তারই বিচার চায়।

—এই তো? ইন্দ্র তখন উঠে হাঁক ডাক সুরু করে দিলেন। সেক্রেটারীকে ডাকলেন, বললেন—জানিয়ে দাও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে, মহাশক্তিকে, পরম ব্রহ্মকে। ছাগল ভেড়া মোষরা নালিশ করেছে। ধরে আনো সুরথ রাজাকে।

সুরথকে ধরতে গেল তো, মা-দুর্গার বা মা-চণ্ডীর নারী বাহিনীর প্রধান জয়া বিজয়া এসে বললে—তা হয় না! মা দুর্গার প্রসাদে সে স্বর্গে এসে দেবতা হয়েছে। তাকে ধরবে কে?

ইন্দ্র বললেন তা হলে একলক্ষ ছাগল মোষ কৈলাসেই যাচ্ছে। তাদের নাই যেতে বলি।

তখন সব দেবতা মিলে পরামর্শ করে ঠিক হল সুরথ রাজা দেবতা অবশ্যই হবেন—কিন্তু তার আগে তাঁকে উপুড় হয়ে শুতে হবে এবং গলায় একলক্ষ বার খাঁড়ার আঘাত খেতে হবে। মা চণ্ডী বললেন, কোন ভয় নাই সুরথ আমি এখানে ওষধ লাগিয়ে দিচ্ছি আর মন্ত্র পড়ে দিচ্ছি আর আমার বর থাকছে যে একলক্ষ কোপ তোমার ঘাড়ে পড়বে কাটবে আবার সঙ্গে সঙ্গে জুড়বে, রক্তপাত হবে না।

তাই শুলেন উপুড় হয়ে রাজা সুরথ। আর ছাগল মোষ ভেড়ারা এসে কোপ মেরে শোধ তুলে নিয়ে গেল। তারপর সুরথ রাজা উঠে গায়ের ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে রাজবেশ পরে দেবতা হয়ে জেঁকে বসলেন। সেই থেকে আইন হয়ে গেল দেবতার পূজোর জন্যেই হোক আর যার জন্যেই হোক অপরের অনিষ্ট করলে তোমাকে তার দণ্ড পেতে হবে। এই দেখুন বিবেচনা করে নিজের চক্ষেই দেখুন কাণ্ড কারখানাটা এবং উপলব্ধি করুন সুরথ পরিণাম এ্যাক্ট কাকে বলে। ব্যাপারটা কি?

জিজ্ঞাসা করলাম—কি দেখব?

গোপী মিত্র বললেন—ওই দেখুন ওই যে সামনের বাড়িটাতে ওই দেখুন—ওটা হল শনি ঠাকুরের বাড়ি—

দেখলাম একটা কুকুর যেন লেজ কুঁকড়ে নিয়ে পিছনের পা দুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে সভয়ে পালাচ্ছে। বিরাট বড় কুকুরটা। ভয়ানক দেখতে। হবেই তো, তাতে বিস্মিত হইনি কারণ কুকুরই শনি ঠাকুরের বাহন। কিন্তু ওটা এত ভয় পেলে কি দেখে?

গোপী বললে—ওই যে ওকে দেখে।

দেখলাম —কুকুরটার পিছনে গুঁড়ি মেরে একটা লোক যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম লোকটা কে ?

গোপী বলে উঠল – নিয়েছে রে, ঠিক নিয়েছে, মোক্ষম নিয়েছে। 'কি নিয়েছে' জিজ্ঞেস করতে হল না চোখেই দেখলাম গুঁড়ি মেরে চলা লোকটা একটি ঝাঁপ দিয়ে খপ করে কুকুরটার পা কামড়ে ধরেছে। ভীষণ শক্ত করে কামড়ে ধরেছে। কুকুরটা প্রায় কোমর ভেঙে শুয়ে পড়েছে ; কোন রকমে সামনের পা দুটোর উপর দাঁড়িয়ে তারস্বরে কাঁই কাঁই কাঁই শব্দে আর্তনাদ করছে।

গোপী মিত্তির বললে—আহা বাছা আমার—

আমি বললাম—ব্যাপার কি মিত্তির ?

—ব্যাপার কি মিত্তির ? ভেঙিয়ে উঠল মিত্তির আমাকে। বুঝতে পারছ না ? তবে বই লেখো কি করে ? লোকটা হল চোর। যখন চোর ছিল তখন ওই কুকুরটা ছিল বাবুদের বাড়ির কুকুর। রাত্রে চুরি করতে এলে কুকুরটা ঠিক অমনি করে খপ করে কামড়ে ধরে ঝুলতে আরম্ভ করছিল। ব্যাটা চোর ঠিক এমন চিৎকার করেছিল—গিয়েছি রে গিয়েছি রে বাবা-রে মা-রে ! এখন পরলোকে এসে সুরথ পরিণাম এ্যাক্টে পড়ে গেছে। মরছে। এখন কত কাল যে ধরে থাকবে তার তো ঠিকানা নেই।

আমি বিস্ময়ে দেখলাম কুকুরটার সে কি নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। লোকটা স্রেফ পিছনের পাখানা কামড়ে ধরে একখানা দেড় মন ওজনের পাথরের মত ভারী হয়ে কুস্তির পালানোর মত মাটি নিয়েছে।

ঠিক এই সময় বাজল আবার কাঁসর ঘণ্টা।

গোপী বললে—চলুন চলুন। সেসন আরম্ভ হবে। চোখ বুজুন।

আমি চোখ বুজলাম !

মনে হল সোঁ করে আমি যেন ভেসে চলে এলাম। গোপী বললে—বাস ! চোখ খুলে দেখলাম। সে এক আশ্চর্য দরবার ;

বিরাট বিশাল অসীম অনন্ত, প্রসন্ন প্রশস্ত গম গম করছে, থমথম করছে। ঝলমল করছে।

গোপী বললে—এই হল বিধি-বিধানালয়।

—বি—ধি বি-ধা-না—লয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিবেচনা করুন এখান থেকে আইনকানুন পাস হয় আর সেই আইনে বিশ্বজগৎ চলে।—ওই দেখুন বিধানালয়ের প্রেসিডেন্ট।

দেখলাম সামনে সব থেকে উঁচুতে সোনার মত উজ্জ্বল কোন একটা ধাতুর তৈরী আসন। যেন আগুনের মত জ্বলছে। কিন্তু আসনে বসে কেউ নেই। খালি। জিজ্ঞাসা করলাম প্রেসিডেন্ট কই? আর ইনি কে হলেন?

—কি কাণ্ড? ও মশায় উনি তো বসে রয়েছেন।

—কি বলছেন? কই? দেখান।

গোপী বললে—পরম ব্রহ্ম যে চক্ষুর অগোচর, চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না তাঁকে দেখবেন কি? ওই ভাইস প্রেসিডেন্টকে দেখুন ওকে বরং দেখতে পাবেন। ওই যে, প্রেসিডেন্টের সামনের নীচেই আসন। রজতাসন। ওই যে মেয়েটি।

ও তো মেয়েছেলে।

—হ্যাঁ। তা কি হল? আপনাদের মর্ত্যলোকে আজকাল মেয়েরা মিনিস্টার হচ্ছে। আমাদের পরলোকে চৌদ্দভুবনের শাসনে মহাশক্তি চিরকাল ভাইস প্রেসিডেন্ট।

এতক্ষণ পরে বন্দরের গিন্নী বললেন—ওই দেখ বাবা আমাদের মন্ত্রী তিনজন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর!

গোপী বললে—ওই দেখুন ওদিকে বসে লর্ড মেয়র অব স্বর্গধাম, বিবেচনা করুন মানে উনি ইন্দ্রদেব। ওই হল এই চাদর গায়ে দিয়ে—মানে হলেন বায়ু। বুঝলেন। ওই অগ্নি! ওই যে লালচে চুল লালচে দাড়ি। হ্যাঁ।

বন্দর গিন্নী বললেন ওই কালো মসকোর মত সাদা চোখ সাদা দাঁত হাতে গদা—ওই উনি হলেন গিয়ে যমরাজা। বাবা শিবের ডেপুটি মিনিস্টার।

গোপী বললে—না মা ওই সুরথ রাজা ডেপুটি মিনিস্টার হওয়ার সময় থেকে উনি মিনিস্টার অব স্টেট হয়েছেন। প্রলয় এবং লয় মিনিষ্ট্রির মিনিস্টার হলেন মহারুদ্র বোম ভোলানাথ। ওঁর অধীনে মিনিস্টার অব স্টেট হলেন—যমরাজা, সেক্রেটারী চিত্রগুপ্ত আর ডেপুটি মিনিস্টার হয়েছে ওই সুরথ রাজা।

আমি অবাক্ হয়ে সব শুনছিলাম। স্বর্গেও দেখি অবিকল মর্ত্যের কাণ্ড? এমন সময় প্রেসিডেন্টের সামনের টেবিলের উপর হাতুড়ির ঠকঠক শব্দ উঠল। গোপী বললে—চুপ চুপ আরম্ভ হল। বলতে বলতেই একটা দরজা খুলে দিয়ে একদল আশ্চর্য আশ্চর্য প্রাণী জন্তু বা সভ্য এসে প্রবেশ করলে। আমি হাঁ হয়ে গেলাম। ভিড় করে কলরব করে প্রবেশ করলে একটা সিংহ, একটা ষাঁড়, একটা ভীষণদর্শন মহিষ, একটা বিচিত্র জীব হাত পা মানুষের মত প্রকাণ্ড পাখা, মুখে ভয়ংকর দেখতে একটা ঠোট, হাতে পায়ে থাবা, মাথায় মুকুট—আধামানুষ আধাপাখি।

গোপী বললে—গরুড়ও যোগ দিয়েছে।

তার ঠিক পিছনে একটা প্রকাণ্ড বড় হাঁস।

হাঁসটা অত্যন্ত কর্কশ প্যাঁক প্যাক গলার আওয়াজে ক্রুদ্ধ ভাবে বলে উঠল—দাঁতের বদলে দাঁত চাই। ব্রহ্মা শুধু আমার পিঠে চাপেনি, লিখবার কলমের জন্যে আমার ডানার পালক ছিঁড়ে তার থেকে কলম বানিয়েছে। আমি ব্রহ্মার মাথার চুল এবং মুখের দাড়ি টেনে টেনে ছিঁড়তে চাই।

অগ্রগামী জন্তুগুলি একসঙ্গে কলরব করে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার পূর্বেই বাইরে থেকে যত পাহারাওয়ালারা চিৎকার করে উঠল—সাবধান সাবধান হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার।

কিসের জন্য হুঁশিয়ার তা আর বলতে হল না, দশ বিশটা হাতি যেন একসঙ্গে গলা মিলিয়ে আওয়াজ করে উঠল। যাকে বলে বৃংহতি নাদ—তাই। থরথর করে কেঁপে উঠল বিধানালয়ের বাতাসের স্তর। নীল আকাশের ছাদে তার প্রতিধ্বনি উঠল,—কিন্তু তার থেকেও ভয়ানক বোধ হল সে যা বললে তার অর্থ। সে বললে—কোথায় মাস্টার ইন্দ্র—আমি এখনই তার ঘাড়ে চাপব আর মাতলী মাহুত কাঁহা গিয়া? বোলাও উস্কো। তার মাথায় ডাঙশ মারেগা হম্।

তার পিছনে একটা ঘোড়া চিঁহি চিঁহি চিৎকারে সে এক বিশ্রী গোলমালের সৃষ্টি করলে। সে বললে—হতেই পারে না, তোমার আগে আমি। তুমি ওই দেহ নিয়ে দেবরাজের ঘাড়ে চড়লে দেবরাজ চেপটে চামড়া হয়ে যাবে। সুতরাং আমি আগে চেপে নেব! উচ্চৈঃশ্রবার দাবি আগে।

ঠকঠক ঠকঠকঠক—! শব্দ উঠল প্রেসিডেণ্ট আকার অবয়বহীন পরমব্রহ্মের টেবিলের উপর থেকে। প্রেসিডেণ্ট টেবিলে হাতুড়ি ঠুকছেন—চুপ চুপ নিস্তব্ধতা নিরবতা সভ্যতা ভদ্রতা নিয়মানুবর্তিতা শীলতা শীলতা।

জন্তুর দলের মধ্য থেকে কে যেন চিঁ-চিঁ গলায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আওয়াজে চিৎকার করে উঠল—না-না-না। জিঘাংসা বিজিগীষা, জিহীর্ষা (হরণ করিবার ইচ্ছা) জিন্দাবাদ। চুপ আমরা করব না।

বলতে বলতে জন্তু দলের পায়ের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট জন্তু, চেয়ার বেঞ্চির তলা দিয়ে খরখর করে ছুটে বেরিয়ে এল। এবং একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ফুলে বড় হতে লাগল। দেখতে দেখতে সেটা একটা বুনো শূয়োরের মত বড় হয়ে উঠল। এবং শক্ত শক্ত গোফগুলো ফুলিয়ে ভয়ংকর হিংস্র ভাবে, দুই পাটি তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে, সামনের পা দুটোর উপর ভর দিয়ে লাফ দেবার উদ্যোগ করলে?

সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর ভুঁড়িশুদ্ধ উপুড় হয়ে শুয়ে হাঁজরে পাঁজরে কোন রকমে দেবতাটি উঠে পড়ে হাঁসফাঁস করে হাঁপাতে লাগল। তার মাথাটি হাতির সুতরাং সে গণেশ এ চিনতে আমার এক মিনিট কি এক সেকেণ্ডও দেরী হল না। গণেশ টেবিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে ওঠা ইঁদুরটাকে ধমক দিয়ে বলে উঠল—খবরদার। এখনও বিল পাস হয়নি।

এমন সময় উঁ—প শব্দে আকাশমণ্ডল কম্পিত করে লম্ফ প্রদানপূর্বক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন বীর হনুমান। এবং বারকয়েক খ্যাকার খ্যাক খ্যাকার খ্যাক খ্যাকার খ্যাক শব্দে হুংকার ছেড়ে বললে—কোথায় রাম আমি তার ঘাড়ে চড়ব! তারপরই হেঁকে উঠল নয়া জমানা: সঙ্গে সঙ্গে জন্তুরা সমস্বরে বলে উঠল জিন্দাবাদ! শোধ লেগা শোধ বোধ! গণেশের ইঁদুরটা আবার চিৎকার করে উঠল—জিঘাংসা বিজিগীষা জিহীর্ষা জিহীর্ষা—নাও শোধ ঘাড়ে চড়ো! ঘাড় থেকে সব নামিয়ে ফেল। ফেলে দাও।

সে এক ভীষণ কাণ্ড। সিংহ গর্জন করলে, ষাঁড় শিঙ উঁচিয়ে হেঁকে উঠলে, গরুড় তীক্ষ্ণ চিৎকার করলে—হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে উঠল, যমের মহিষ গাঁক গাঁক করে উঠল, ইন্দ্রের হাতি ঘোড়া চেঁচাতে লাগল, গণেশের ইঁদুর চিকচিক, চিঁচিঁ শব্দে আস্ফালন করলে, লক্ষ্মীর প্যাঁচা চেঁচালে। সরস্বতীর হাঁসটি এতক্ষণ ছিল না সে ঝটপট শব্দে ডানা চালিয়ে এসে বসে পড়ে প্যাঁক প্যাঁক করলে। সর্বোপরি হনুমানজীর উঁ—প উঁ—প উঁ—প চিৎকার।

প্রেসিডেন্টের হাতুড়িটা মিথ্যে মিথ্যেই ঠক ঠক ঠকঠক করতে লাগল।

*　　　　*　　　　*

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন একজন। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুরা বললে চুপ চুপ। মহামান্য ডেপুটি মিনিস্টার সুরথ উঠেছেন। বিল আনছেন।

সুরথ একজন বেশ বীর-বীর রাজা-রাজা চেহারার লোক—বেশ পাকানো গোঁফ আছে এবং কাঁচাপাকা বাবরি চুল, দু কানে দুটো বীরবৌলি, ওই মাকড়ির মতোই একটা গয়না, কিন্তু পরলে ভালোই লাগে। সুরথকে ভালোই দেখাচ্ছিল। সুরথ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—মহামান্য প্রেসিডেন্ট, সুরথ পরিণাম বিলের এবার শেষ অধ্যায় শেষ সংশোধন হচ্ছে এবং ওর শেষ চেহারা দেওয়া হচ্ছে। সেই সত্য যুগে আমি যখন ভূমণ্ডলে ছিলাম, তখন রাজ্যহারা হয়ে ওই যে আমাদের সহকারী রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রনেত্রী মহাশক্তি আদ্যাশক্তি, তার পূজা আরাধনা করেছিলাম। মেধস মুনি মন্ত্রতন্ত্র বাতলে দিয়েছিল। মাটি দিয়ে প্রতিমাও গড়ে দিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই দেখা পাই না। শেষ পর্যন্ত একলক্ষটা ছাগল মোষ ভেড়া বলি দিয়ে মানে কেটে ফল হল খাঁড়াটা সোনার হয়ে গেল আর মাটির প্রতিমা জীবন্ত হয়ে উঠল। আমাকে বর দিলেন। আমি মর্ত্যে সুখ ভোগ করে স্বর্গে এলাম তো দেবতারা আমার বিচার করে বললে—এক লক্ষ ছাগল মোষ কেটেছে, প্রাণী হত্যা করেছে, সুতরাং এক লক্ষ কোপ আমাকে খেতে হবে। বিল পাস হল। নাম হল—সুরথ পরিণাম বিল। এ বিল বারবার সংশোধিত হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির সত্যবাদী ছিলেন, সারা জীবনে কেবল একটি মিথ্যে কথা বলেছিলেন—না মিথ্যে কথাও নয়, সত্য কথা খুব আস্তে বলেছিলেন—অশ্বত্থামা মরেছে—কথাটা জোরে বলে বলেছিলেন, অশ্বত্থামা নামক হাতিটা। এর জন্য আমাদের স্থিতি দপ্তরের মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীও বটেন তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সর্বাগ্রে নরক দেখিয়েছিলেন। তারপর স্বর্গে স্থান দিয়েছিলেন। অন্য দেবতারা এবং সিদ্ধ মুনি ঋষিরা ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—এটা কি ঠিক হল? কারণ ওই ভাবে 'ইতিগজ' মানে অশ্বত্থামা হাতি কথাটা আস্তে বলতে তো আপনিই বলেছিলেন। প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন কি করব? বে-আইনী তো করতে পারি না। আরও বলেছিলেন—

দেখ না স্বয়ং লক্ষ্মী যিনি গৃহিণী এবং চৌদ্দ ভুবনেব ফিনান্স ফুড এগ্রিকালচারের মত তিনটে দপ্তবেব মিনিস্টাব তিনি পর্যন্ত একবার চৈত্র মাসে মর্ত্যভূমে গিয়ে এক বামুনেব জমি থেকে একমুঠো তিল ফুল তুলে কানে পরেছিলেন, চুলে পবেছিলেন বলে সারা বছর ওই বামুনের বাড়িতে ঝিগিবি কবেছিলেন বেহাই পাননি। সুতরাং যুধিষ্ঠির রেহাই পান কি কবে ? ব্যাপারটা দস্তুবমত কাগজে কলমে রেকর্ড হয়ে আছে। সেটা হল কলি যুগেব আবম্ভ। সেই সময় থেকে কলি যুগে দেবতাদেব মধ্যেই এই দেবতাটি আই মীন এই দেবীটি যিনি নাকি এডকেশন অ্যাণ্ড জ্ঞান ডিপার্টমেণ্টের মিনিস্টার তিনি এবং তাঁব অধীনস্থ ডেপুটি মিনিস্টাব হাফ দেবতা বিশ্বকর্মা দুজনে পৃথিবীতে মানুষদেব মধ্যে আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছে। শিক্ষা আব সে শিক্ষা নাই। মানুষেবা বলছে—জয় ভগবান সবশক্তিমান জয় জয় ভবপতি নেহি চলেগা। ভগবান নেহি হ্যায়। ঝুট হ্যায়। বলছে—ভগবান নাই দেবতা নাই অপদেবতা নাই ভূত নাই স্বর্গ নাই নবক নাই, চৌদ্দ ভবন নাই।

কে একজন চিৎকার করে উঠল—তবে আছেটা কি ?

সরস্বতী দাঁড়িয়ে উঠে শক্ত গলায় বললেন—হে অলীক মানে মিথ্যে মিথ্যি মায়ার সৃষ্টি পুতুলনাচের পুতুল সব, তোমবা সত্যই নাই। আছে শুধু মানুষ। মানুষেরাই তোমাদের পাথর কেটে মাটিতে গড়ে কাগজে এঁকে তৈরী করেছে। চালকলা ফলমূল দিয়ে পুজো করে তাই তোমাদের সম্বল। এ সব মিথ্যা আর চলবে না।

বিষ্ণু উঠে বললেন এই সরস্বতী ঠাকরুনটিকে এই জন্যে দেখতে পারিনে আমি। সব ওলোটপালোট করে দিলে। বেশ তো মানুষের সঙ্গে বোঝাপড়া সে হবে পরে, তারা পুজো বন্ধ করুক। তারপর দেখা যাবে এখন দেবতাদের বাহনদের খেপিয়ে তুলে এটা কি হয়েছে ? তোমারও তো হাঁস আছে, সেও তো বলবে মাথায় চাপবে।

সরস্বতী বললেন—আমি আর হাঁসে চড়ি না। হাঁসটা আমার সঙ্গ ছাড়ে না তাই সঙ্গে থাকে। আমি এখন যাওয়া আসা করি জেট প্লেনে হেলিকোপ্টারে মোটরে। বিজ্ঞানের ডেপুটি মিনিস্টার বিশ্বকর্মা স্পেস্‌শিপ করেছে, আমি তাই চড়েই আজ এখানে এসেছি পৃথিবী থেকে। দেখতে এসেছি বাহনেরা তোমাদের পিঠে চড়লে কেমন লাগে তাই দেখতে।

দেবরাজ ইন্দ্রের পিঠে উচ্চৈঃশ্রবা চড়বে, ঐরাবত চড়বে। শিবের কাঁধে চড়বে ষাঁড়। ব্রহ্মার জটার উপর হাঁস বসে ডিমে তা দেবে, বিষ্ণুর চাঁচর চুলের ঝুঁটির উপর গরুড় মহারাজ বসে বলবে—হেট জলদি চল জলদি চল।

বিষ্ণু বলে উঠলেন—তুমি বুঝি খুকিটি হয়ে হাততালি দিয়ে নাচবে হায় কী মজা হায় কী মজা বলে?

সরস্বতী বললেন—নাচবই তো।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সরস্বতী, কিন্তু বাধা দিয়ে সুরথ রাজা বললেন—তা হলে এই বিল আমি উপস্থিত করছি, দেবতাদের বাহনেরা এবার-থেকে সুরথ পরিণাম বিল অনুযায়ী দেবতাদের পিঠে চড়ে শোধ নেবেন। দেবতারা লক্ষ্মীর তিলগুনা খাটার নজীরে যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের নজীরে বাহনদের পিঠে করে বইতে বাধ্য থাকবেন।

জন্তুরা চিৎকার করে উঠল, দেবতাদের একটা অংশ চিৎকার করে উঠল—সুরথ বিল জিন্দাবাদ। ইন্দ্ররাজা কুপোকাৎ। ব্রহ্মা বিষ্ণু বরবাদ। উঠাও পাও! চড়াও কাঁধে।

বিষ্ণু বললেন—দাঁড়াও।

—দাঁড়াবে কেন? দাঁড়াবে কেন?

—জরুর দাঁড়াতে হবে।

—কেন?

—ওরা কি মরেছে? ভূত হয়েছে, যে এই নিয়মে দেবতাদের

ঘাড়ে চড়বে! আগে মরতে হবে।

প্রচণ্ড প্রতিবাদ উঠল। না-না-না।

সে প্রতিবাদের কোলাহল চৌদ্দ ভুবনকে একেবারে ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে থরথর করে কাঁপিয়ে দিলে। পৃথিবী কাঁপল ভূ ভুবনপুর কাঁপল স্বর্গ ভুবনপুর কাঁপল কৈলাস কাঁপল গোলক কাঁপল ব্রহ্মলোক কাঁপল বৈজয়ন্তীপুর কাঁপল যমপুরী কাঁপল, সব থরথর করে কাঁপতে লাগল। দেবতাদের কান না পেতে আর উপায় নেই! সবাগ্রে শিবের ষাঁড়টা রাগ করে শিবের মোটা পেটে শিঙ দুটো লাগিয়ে বলতে লাগল —দিই ফুটিয়ে? দিই?

এমন সময় উল্কার মত বেগে এক অপরূপ জ্যোতির্ময় পুরুষ একটা হরিণের উপর চেপে হরিণসুদ্ধই বিধানালয়ের মধ্যে ঢুকে গেল। বিধানালয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এসেই সেই সুন্দর পুরুষ লাফ দিয়ে নামলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বললেন—হে পরম ব্রহ্মা সর্বনাশ উপস্থিত।

—সর্বনাশ? কি সর্বনাশ?

—প্রভু মানুষেরা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, সেই যন্ত্রে চড়ে একেবারে আমার বুকের উপর এসে নেমেছে। চারিদিকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাছে আমাকে ধরে নিয়ে যায় তাই আমি হরিণে চড়ে পালিয়ে এসেছি। কোনমতেই তাদের আসা বন্ধ করা যাবে না। এখন উপায় বিধান করুন।

সমস্ত দেবতাদের মুখ মলিন হয়ে গেল। স্বরস্বতী শুধু হাসতে লাগলেন।

সকল দেবতা তখন হাতজোড় করে বললেন—সর্বনাশ! মানুষে ধরে নিয়ে গেলে আমাদের বেঁধে খাটাবে। হে পরম ব্রহ্ম তুমি আমাদের বাঁচাও।

পরম ব্রহ্মকে দেখা গেল না, শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তা হলে এই মুহূর্ত থেকে 'ফুস ধা' বিল পাস হয়ে গেল। সেই বিল

অনুযায়ী ভূত প্রেত প্রেতিনী, পিশাচ ডাকিনী হাকিনী অপদেবতা উপদেবতা মায় সবাহন সর্ব দেবদেবী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সব ফুস ধা হয়ে পবম ব্রহ্মে বা কিছুই না-তে মিশে গেলেন।

স্বর্গ বইল না। নরক বইল না—

পাসড।

দেবতা রইল না। ঈশ্বব বইল না।

পাসড।

ভূত রইল না।

পাসড।

রইল কে?

রইল তা হলে মানুষ।

বলতে বলতে সব যেন বোঁ বোঁ কবে ঘুবতে লাগল!

আমি ধপ করে পড়ে গেলাম মনে হল।

আমার সেই অঙ্গুলি প্রমাণ আত্মা ঘুরতে ঘুরতে এসে মর্ত্যধামে আমার এই হাঁ করে পড়ে থাকা দেহখানার কাছে এসে মুখের মধ্যে সুড়ুৎ কবে ঢুকে গেল। আমি আড়মোড়া ছেড়ে উঠে বসলাম।

সহচর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গী ভদ্রলোক হঠাৎ আবিষ্কার করলেন সামনের একখানা ছয় বার্থের সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ করেছেন তাঁরই পরিচিত একদল এবং তাদের বার্থ খালি যাচ্ছে একখানা। খবরটা সংগ্রহ হতে না হতেই হৈ হৈ করে তিনি মালপত্র টেনে নামালেন। যাওয়ার সময় একগাল হেসে বলে গেলেন, "ভালোই হল মশাই আপনার। এখন আপনিই একচ্ছত্র। বেশ সম্রাটের মত ঘুমিয়ে যেতে পারবেন।"

'সম্রাট', 'একচ্ছত্র'—এসব ভালো ভালো কথা শোনবার আগেই আমি অনুমান করেছিলুম। বাইরের কার্ডে যাঁর নাম ছিল, তিনি এ-কালের একজন দিকপাল সাহিত্যিক। আমি তাঁকে অবশ্য কখনো দেখিনি; কিন্তু তাঁর ছবির সঙ্গে এ ভদ্রলোকের চেহারারও সাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট। তাই একখানা 'কুপে'তে ওপরের বার্থে এমন একজন ভয়ঙ্কর বিখ্যাত সঙ্গীকে নিয়ে ট্রেনযাত্রার কল্পনায় রীতিমতো শঙ্কিত ছিলুম আমি।

সাহিত্য এবং সাহিত্যিক—দুটোকেই আমি নিদারুণ ভয় করি। আমি কাজ করি ষ্ট্যাটিসটিক্‌সে এবং এ-কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই সংখ্যাতত্ত্বের কাছে রসতত্ত্বের স্বাদ অত্যন্ত জোলো বলে মনে হয় আমার কাছে। সারা ভারতবর্ষে বছরে কোন ভাষায় কত বই ছাপা হয় তার হিসেব মোটামুটি একটা দিতে পারি। কিন্তু ঊর্ধ্বলোক বিহারী সাহিত্যিক মহারথটি যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কী কী বই আমি পড়েছি—তা'হলেই গেছি। মানসাঙ্কে ফেল্ করা ছাত্রের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া নাস্ত্যেব গতিরন্যথাঃ!

কাজেই তিনি নেমে যেতে বেশ খানিকটা স্বস্তিই অনুভব করলুম -সন্দেহ কী! বেশ করে নিজের মতো বিছানা পেতে নিলুম। গুছিয়ে নিলুম জিনিষপত্র। তারপর আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে মুখাগ্নি করলুম সিগারেটে।

হাওড়া থেকে যখন ট্রেনটা ছাড়ল—সেই স্বস্তির আনেজে তখনও ভরপুর হয়ে আছি, পর পর উদ্দামবেগে যখন কয়েকটা ষ্টেশন ছিটকে বেরিয়ে গেল, তখনও। কিন্তু আলো নিভিয়ে শোওয়ার উপক্রম করতেই কিরকম একটা অদ্ভুত অশান্তি আমাকে পেয়ে বসল।

হঠাৎ মনে হতে লাগল, আমি একা, শুধু এই ছোট কামরাটুকুর মধ্যেই নয়—এই বিশাল ট্রেনটাতে আমি একা ছাড়া আর কোথাও কোন যাত্রীই নেই। একটা অতিকায় ভুতুড়ে গাড়ি আমাকে নিয়ে একরাশ অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কোথায় যাচ্ছে আমি জানি না, হয়তো গাড়িটারও সেকথা জানা নেই!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি উঠে বসলুম—আলো জেলে দিলুম। আর তীক্ষ্ণ তীব্র আলোর একটা ঝাপটা চোখে এসে লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই অস্বস্তির ঘোরটা কেটে গেল। সত্যি কথা বলতে গেলে হাসিও পেল আমার। সাহিত্যিকের সঙ্গগুণ আছে বটে! ভদ্রলোক আমার সহযাত্রী না হতেই তাঁর ব্যাধি এসে আমাকে ছুঁয়েছে—সঙ্গে থাকলে আর রক্ষা ছিল না দেখা যাচ্ছে। কী করে যে এ-সব উদ্ভট কল্পনা মাথায় এল…আশ্চর্য!

এক গ্লাস জল খেয়ে, একটা আলো জেলে রেখে শুয়ে পড়লুম আবার।

কিন্তু চোখের কাছে আলো জ্বললে আমার কিছুতেই ঘুম আসেনা। বিরক্ত হয়ে আমি এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগলুম। অথচ আলো নিভিয়ে দিতেও সাহস হচ্ছে না—পাছে আবার ঐ সমস্ত এলোমেলো ভুতুড়ে ভাবনা আমাকে পেয়ে বসে। চোখের পাতা দুটোকে যথাসাধ্য চেপে ধরে প্রাণপণে ঘুমের সাধনা শুরু করলুম

সেও মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। তারপরেই আর একটা নতুন ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল, বড় বেশী জোরে যাচ্ছে নাকি গাড়িটা—বড় বেশী অস্বাভাবিক স্পীডে? যতগুলো রেলওয়ে অ্যাকসিডেন্টের খবর জানি একটার পর একটা মনে পড়ে যেতে লাগল সে সব। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অন্ধের মতো ছুটছে ট্রেনটা—পার হয়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত গ্রাম, শূন্য প্রান্তর, কালো জঙ্গল, নদীর পুল। এই নির্জন নিশীথ-যাত্রা যেন ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কে বলতে পারে কোথায় আলগা হয়ে আছে একটা ফিশ্-প্লেট, কোথায় নীচের পিলারে ধরেছে ফাটল। মুহূর্তের ভেতরে লাইন থেকে ছিটকে পড়ে যেতে পারে ট্রেনটা, তারপর—

আবার আমি নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। কী আশ্চর্য—কেন এ সমস্ত অবান্তর অর্থহীন ভাবনা আমার। প্রতিদিন, প্রতি রাত এমনি অসংখ্য ট্রেন সারা ভারতবর্ষময় ছুটে বেড়াচ্ছে, তাদের ক'খানাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়? দুর্ঘটনা ঘটার ভয় আমার যত বেশী, তার চাইতেই অনেক বেশী রেল কোম্পানীর এই গাড়ী যারা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। কম করেও তিন চারশো মানুষের প্রাণের দায়িত্ব যাদের হাতে, এ সব ভাবনা আমার চাইতে ঢের বেশী ভাবছে তারা।

আমি আবার উঠে পড়লাম, টয়লেটে ঢুকে মাথায় চোখে ঠাণ্ডা জল দিলাম খানিকটা। একা গাড়িতে এভাবে চলবার অভিজ্ঞতা জীবনে আমার প্রথম নয়—যার জন্যে এই সমস্ত ছেলেমানুষী দুশ্চিন্তা আমাকে পেয়ে বসবে। কোনো কারণে মাথা গরম হয়ে গেছে, তাই এই কাণ্ড!

দুটো পাখারই রেগুলেটার পুরো ঠেলে দিয়ে, গাড়ি অন্ধকার করে আবার শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই অদ্ভুত ভয়টা যেন বুকের ওপরে এসে চেপে বসতে লাগল, মনে হতে লাগল, কোথায় কি যেন ঘটতে চলেছে···কী একটা নিশ্চয় ঘটবে। আজ হোক কাল হোক—এই গাড়িতে হোক, আর কোথাও হোক।

আরো মনে হতে লাগল, এই গাড়িতে এখন আর আমি একা নেই, আমার সঙ্গে আর কেউ—অথবা আর কিছু একটা চলেছে। আমার এই বার্থ টার নীচেই সে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। একবার মাথা নামিয়ে নীচের দিকে তাকালেই তার দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আমি দেখতে পাব!

কিন্তু এইবার আমি নিজের ওপরে চটে উঠলাম। পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি আমি? কোনো কারণ নেই—কোনো অর্থ নেই, তবু পৃথিবীর যত অবান্তর উদ্ভট কল্পনা আমাকে পেয়ে বসছে! হালে কতগুলি বিলিতী ভূতের গল্প পড়েছিলাম, হয়তো তারই প্রতিক্রিয়া এ সব।

এই অদ্ভুত অস্বস্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে এবার আমি মনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলাম দস্তুর মতো। প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করলাম সংখ্যা-তত্ত্বের কতগুলো জটিল সমস্যা—যা ভেড়া গোনবার চাইতেও কার্যকরী। তারপর—প্রায় আরও একঘণ্টা পরে গাড়ি খড়্গপুর ছাড়িয়ে গেলে, আমার চোখে ঘুম নেমে এল।

কিন্তু কে জানত—জেগে থাকার চাইতেও আরও বীভৎস হয়ে উঠবে ঘুমটা। মনের সমস্ত সরীসৃপ ভাবনা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ঘুমের ভেতরে। আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

অদ্ভুত কুৎসিত সে স্বপ্ন। পরিষ্কার—দেখলাম একটা ন্যাড়া নগ্ন পাহাড় আমার সামনে। তার কোথাও একটা গাছপালা নেই—এক গুচ্ছ ঘাস পর্যন্তও নয়! কলকাতার চিড়িয়াখানার অতিকায় কচ্ছপগুলোর মতো বড় বড় পাথরে ছেয়ে আছে তার সর্বাঙ্গ। চারিদিকে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। শুধু পাহাড়টার মাথার উপরে পড়ন্ত বেলার খানিক রক্তরৌদ্র কারো নিষ্ঠুর ভ্রূকুটির মতো জ্বলছে। আর সেখানে—সেই অশুভ রাঙা আলোয় ডানা মুড়ে বসে আছে একটি মাত্র শকুন—যেন অপেক্ষা করে আছে কালপুরুষের মতো!

কিন্তু ওইখানেই শেষ নয়। আরো ছিল তারপর। আমি

দেখলাম সেই পড়ন্ত আলোয়, সেই ভয়ঙ্কর নগ্নতার ভেতরে—শকুনের সেই ক্ষুধার্ত চোখের নীচে চারজন মানুষ একটা মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে চলেছে। কোথায় চলেছে জানিনা—তাদের চারজনের মুখেই একটা বিবর্ণ ক্লান্তি। আব—আর সেই শববাহকদের মধ্যে আমি একজন !

চিৎকার করে আমি জেগে উঠলাম। আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে তখন দরদর করে ঘাম পড়ছে। চলন্ত ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে বেজে উঠেছে আমাব হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ !

আলো জ্বেলে দিয়ে উঠে বসলাম এবার। না—আব ঘুমোব না। যে কোন কারণেই হোক—আমার মধ্যে নিশ্চয় কোথাও কিন্তু একটা গোলমাল হয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম -রাত প্রায় তিনটেব কাছাকাছি। ঐ সময়টুকু না হয় আলো জ্বেলে বসেই থাকব।

এতক্ষণে আমার মনে অনুতাপ হতে লাগল। সাহিত্যিক ভদ্রলোককে ধরেই রাখা উচিত ছিল আমার গাড়িতে। এই দুঃস্বপ্নের চাইতে সাহিত্যচর্চাও নেহাৎ মন্দ ছিল না।

হেলান দিয়ে বসে বসে সংখ্যাতত্ত্ব ভাবতে শুরু করলাম। কিন্তু এতক্ষণে ঘুম আমাকে সত্যিই পেয়ে বসেছে। বসে থাকতে থাকতে আবার চোখ জুড়িয়ে এল।

এবং—

এবং একটু পরেই সেই কুৎসিত স্বপ্নটার পুনরাবৃত্তি ! সেই পাহাড় —সেই পড়ন্ত রোদ—সেই শকুন ! আর তেমনি একটা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে আমরা চারজন শবযাত্রী !

এবার চিৎকার নয়—আর্তনাদ করে সোজা হয়ে বসলাম। আর পাশের জানালার জালের ভিতর দিয়ে যদি ভোরের ফিকে আভাস দেখা না যেত—তা হলে হয়ত চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দিতুম, নয়ত ঝাঁপিয়ে পড়তুম দরজা দিয়ে !

উঠে সমস্ত জানালাগুলো খুলে দিলাম। সূর্য ওঠেনি এখনো

—বাইরের গাছপালা, মাঠ আর পাহাড়ের ওপরে শুভ্র-ধূসর ব্রাহ্মমুহূর্ত। একরাশ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে শরীরে—আমি গ্রাহ্য করলাম না। বিদেশী কবির ভাষায় শুধু আমার প্রাণ ভরে বলতে ইচ্ছে করল : "ai', Holy light—"

বেলা আটটার সময় পৌঁছলাম গন্তব্য স্টেশনে। ভূতুড়ে গাড়িটা থেকে নেমে যেন মুক্তিস্নান হল।

ষ্টেশনে একা ছিল। মামাই পাঠিয়েছেন, একঘণ্টার মধ্যেই আট মাইল রাস্তা পার হয়ে গেলাম।

মামা ব্যাচেলর মানুষ, একটু পাগলাটে ধরনের। প্রথম জীবনে সন্ন্যাসী হয়ে কয়েক বছর অজ্ঞাতবাস করেছিলেন, তারপর এখানে এসে ডাক্তারী শুরু করেছেন। একেবারে পাণ্ডববর্জিত গ্রামঅঞ্চল। কয়েক বাক্স হোমিওপ্যাথি ওষুধের জোরেই এখানে ধন্বন্তরি হয়ে বসেছেন তিনি।

পাহাড়, শালবন, একটি ছোট নদী আর কয়েক ঘর দেহাতী মানুষের ভেতরে মামার লাল টালির ছোট বাড়িটি অত্যন্ত মনোরম। জায়গাটার কাব্যসৌন্দর্য, আমি ঠিক বর্ণনা করতে পারব না—সেই সাহিত্যিক ভদ্রলোক থাকলে তিনিই সেটা ভালভাবে করতে পারতেন। মোটের ওপর আমার ধারণা কলকাতা থেকে যারা কিছুদিনের জন্যে দূরে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চান এবং সেই অজ্ঞাতবাসের সময়ে শহরের কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা না হলেই যারা স্বস্তিবোধ করে এ জায়গা তাদের পক্ষে আদর্শ।

অনেকটা আগ বাড়িয়েই মামা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর রগের দু পাশে দু গোছা পাকা চুল ঝকঝক করছিল সকালের রোদে।

কিন্তু তার চাইতেও ঝকঝকে হাসি হাসলেন মামা, "আয়—আয়! পথে কোন অসুবিধা হয়নি তো?"

অসুবিধে! আমি ম্লান হাসি হাসলাম উত্তরে। সারা রাত ট্রেনের সেই দুঃস্বপ্নটা আবার আমার মনে পড়ে গেল।

কিন্তু একটু পরেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করে যখন জ্বালাধরা চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল সব, তখন চামচেতে মুরগীর ডিমের পোচ্ তুলতে তুলতে আমি মামাকে স্বপ্নটা বললাম। শুনে মামা হো হো করে হেসে উঠলেন।

"আসবার আগে মাংস-টাংস খেয়েছিলি বোধ হয়?"

"তা খেয়েছিলাম। একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিলো।"

"তাই এই কাণ্ড। পেট গরম হলেই লোকে ও-সব খেয়াল দেখে। রান্নার তো দেরি আছে—ব্রেকফাস্টটা ভালো করে সেরে নিয়ে ঘণ্টা তিনেক নিশ্চিন্তে ঘুমো। আমি ততক্ষণে গ্রাম থেকে একটা রোগী দেখবার পাট সেরে আসি।"

ব্রেকফাস্ট চুকে যাওয়ার পরে এবং মামার ডাক্তারি ব্যাখ্যাটাকে হৃদয়ঙ্গম করে সমস্ত মনটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেল। তারপর ক্যাম্বিসের খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিতেই আবার ঘুমের পালা। এবার নিঃস্বপ্ন এবং নিশ্চিন্ত।

ঘুম ভাঙল চাকরটার বিকট কান্নায়।

ছুটে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। মামাকে একদল মানুষ বয়ে আনছে কমপাউণ্ডের মধ্যে। তাদের চোখে মুখে শোক আর বেদনার ছাপ। হাউ হাউ করে কাঁদছে চাকরটা।

"কী হয়েছে? কী হয়েছে?" বুকফাটা জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিলাম আমি।

কিন্তু উত্তরের দরকার ছিল না—আমার মন তা আগেই পেয়েই গেছে। তবু কে জানত—মামার হার্টের অবস্থা এত খারাপ ছিল। মাইল চারেক দূরে পাহাড়ী রাস্তায় ওঠবার সময় ঘোড়া থেকে তিনি পড়ে যান। যারা কাছে ছিল, তারা বললে, ঘোড়া থেকে পড়ে তিনি মারা যান নি—পড়বার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাঁদবার মত শক্তি আমার ছিল না।

এসে যখন পড়েছি, তখন শোকে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা চলে না। আট মাইল দূরের পোস্ট্‌অফিসে দরকারী টেলিগ্রাম পাঠিয়ে—সব ঠিক করে, যখন মড়া নিয়ে বেরুলাম—তখন বেলা নেমে এসেছে।

আড়ষ্ট ক্লান্ত পায়ে চলেছি। প্রায় মাইল দেড়েক দূরে শ্মশান।

কিন্তু একি—একি! এখানে সেই ন্যাড়া পাহাড়টা এল কোত্থেকে? কোথা থেকে তার ধারাল চূড়োটার ওপরে অমন করে পড়েছে শেষ বেলার হিংস্র আরক্তিম আলো—কোথা থেকে একটা শকুন এসে সেখানে ডানা মেলে বসেছে কালপুরুষের মতো?

সব এক—সেই স্বপ্নের সঙ্গে সব এক! আমার চারিদিকে সেই অবিশ্বাস্য শূন্যতার সেই প্রেত পাণ্ডব বিস্তৃতি!

অমানুষিক ভয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম—কে যেন আমার পা দুটোকে টানতে লাগল পাথুরে মাটির তলায়। সারা রাত ট্রেনে আমাকে অমন করে ভয় দেখালে কে? আমার বার্থের তলায় গুঁড়ি মেরে যে বসেছিল—সে কে?

সেকি মৃত্যু? আমার সঙ্গে—আমারই সহচর হয়ে এসেছে সে?

পাশানগর

প্রণব রায়

লোকে বলে পদ্মা নদী ভয়ঙ্করী, কিন্তু নদীর ভয়ঙ্করী রূপ যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা জীবনে একবার মাত্র প্রত্যক্ষ করেছিলাম মেঘনার বুকে। দেখতে মেঘনা কালো-কোলো গ্রাম্য মেয়ের মতই শান্তশিষ্ট, নামটিও তেমনি মিষ্টি। কিন্তু মেঘ দেখলে আর অঙ্কে নেই, উদ্দাম উল্লাসে একেবারে পাগ্‌লী হয়ে ওঠে। তাই বুঝি তার নাম মেঘনা।

যে গল্প আপনাদের আজ বলতে বসেছি, মেঘনার এই পরিচয়টুকু তার ভূমিকা। জীবনে এমন এক-আধটা সত্য ঘটনা ঘটে যা গল্পের চেয়েও অদ্ভুত। কিন্তু যা কদাচিৎ ঘটে, তা-ই নিয়েই তো গল্প তৈরী হয়।

ব্যাপারটা ঘটেছিল বছর পঁচিশ আগে। আমরা তখন কলেজ-জীবনে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতি করছি। অর্থাৎ 'শেলী' 'কীটস'-এর বদলে নজরুলের 'অগ্নিবীণা' পড়ি, আর আগ্নেয়াস্ত্র অভ্যাস করি। সারা বাংলার ঝোপে-ঝাড়ে তখন হিংসার নেকড়ে বাঘ ওৎ পেতে আছে বিদেশী রাজশক্তির টুঁটি লক্ষ্য ক'রে। দলের অধিনায়কের কাছ থেকে আমাদের প্রতি নির্দেশ এল একজোড়া পিস্তল অমুক জায়গায় পৌঁছে দিতে। ট্রেনে পুলিশের ফেউ পেছনে লাগতে আঘাটায় নেমে পড়তে হ'ল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রেল লাইনের তু'পাশে কসাড় বনে অসংখ্য জোনাকী জ্বলছে। অগ্নিযুগের ছেলে আমরা, ভয় বলে বস্তুটার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। হাঁটতে সুরু করলাম কসাড় বনের

মধ্যে দিয়ে। মাইলখানেক দূরে লোকালয় পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানতে পারলাম, আমাদের গন্তব্যস্থল এখান থেকে প্রায় বত্রিশ মাইল দূরে। হাঁটা-পথে ভোরের আগে পৌঁছানো অসম্ভব। নদী-পথে বরং চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

নদী মানে মেঘনা নদী। আধ মাইলটাক দূরে। কিন্তু বিপদ হলো এই যে, কোন নৌকো ছাড়তে চায় না। বলে, মেঘনা বড় বদরাগী, চত্তির মাসের শেষ, হ্যাওয়া ডাকলে আর রক্ষে থাকবে না।

শেষে ডবল ভাড়া কবুল করে বুড়ো মাঝি গফুরকে রাজী করানো গেল। আমার গল্প এখান থেকেই সুরু এবং মূল গল্পের মধ্যে রাজ-নীতির গন্ধ আর কোথাও নেই।

দু'জনে নৌকায় উঠলাম। দু'জনে মানে সোমনাথ আর আমি। বুড়ো গফুর বললে, ঘাবড়াবেন না কত্তা, সোতের খুব টান, গাজীর নাম করে তত্‌তরিয়ে চলে যাব।

গাজীর নাম করে বুড়ো গফুর নৌকা দিল খুলে। কিন্তু আমাদের পার করতে গাজী বোধ হয় রাজী ছিলেন না, তাই মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যেই আকাশের দৃশ্যপট গেল বদলে। দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশের প্রান্ত থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ কালো বুনো ঘোড়ার কেশরের মত ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বাতাসে কোন অদৃশ্য সাপুড়িয়া যেন তার তুবড়ী-বাঁশীর সঙ্কেত সুরু করে দিলে। আর যেই সাপ খেলানোর সঙ্কেত শুনতে শেষে, মেঘনা-নদী নাগকন্যার মতই লক্ষ ফণা তুলে দুলে দুলে নাচতে শুরু করলো।

যদিও তখন নিসর্গের এই অপরূপ রূপ উপভোগ করবার মত মনের অবস্থা আমাদের ছিল না, তবুও সেই ছবিটা বোধ করি এ জীবনে ভুলে যাবার নয়। মনে হলো, এলোকেশী রাত্রি যেন দিগ-বসনা মহাকালীর রূপ ধরে প্রলয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে। আর অন্ধকার? কি বলে বর্ণনা করব জানি না। বিরাট—অতি বিরাট একটা দোয়াত উল্টে ফেলে দিয়ে কে যেন আকাশ, নদী, দিগ্বিদিক ভুষো কালী লেপে

একাকার করে দিয়েছে। সে অন্ধকারের আবর্তে আমাদের সত্তাও যেন ডুবে গেছে!

পার্থিব জীবনে যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, ধারণাই করতে পারিনি। এই যদি ঝড় হয়, তবে ঝড় বলে আগে যা দেখেছি, সেগুলো যেন সিনেমা-ই্টুডিওতে তোলা ঝড়ের দৃশ্য!

বাতাসের বুক-চাপড়ানো কান্না ভেদ করে গফুর মাঝির চীৎকার শোনা গেল, হুঁসিয়ার!

কিন্তু হুঁসিয়ার হবার আগেই আমাদের নৌকোটি বন্ বন্ করে বারকয়েক পাক খেয়ে শোঁ করে একদিকে এগিয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে গফুর বলে উঠল, বদর! বদর!

বুঝলাম গফুর পাকা মাঝি। যমের দক্ষিণ দুয়ারে পৌঁছেও সে আমাদের চৌকাঠ পার হতে দেয়নি। অর্থাৎ মেঘনার চোরা ঘূর্ণীর মুখে পড়েও সে নৌকো ফিরিয়েছে।

বললাম, নৌকো লাগাও গফুর—যেমন করে পার।

গফুর বললে, লাগাবো কোথায় কত্তা? আন্ধারে যে লজর—সামাল!

সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢেউয়ের ঘায়ে নৌকোটা দুলে উঠল।

বললাম, আঘাটাতেই নৌকো ভেড়াও গফুর। আর দেরী নয়—

গফুর শুধু বললে, ওই শুনুন—

লক্ষ্য করে শুনতেই ঝড়ের হাহাকার ছাপিয়ে কানে এল ঝপাং ঝপাং শব্দ। বুঝলাম, নদীর পাড় ভাঙ্গছে।

গফুর বললে পাড়ের কাছে গেলে দেখতে হবে না—একেবারে ঠাণ্ডা করব!

এক লহমার জন্যে শরীরের রক্তস্রোত যেন বন্ধ হয়ে গেল। সেইদিন সেই ঝড়ো আকাশের তলায় ক্ষ্যাপা নদীর বুকে আর সেই ভয়ঙ্কর গহন অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে মনে হলো, মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছি! আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অথবা ফাঁসীর মঞ্চে শহীদের মৃত্যু এ নয়, এ মৃত্যু

অন্ধ নিয়তির নিষ্ঠুর খড়্গের নীচে বিনা প্রতিবাদে গরু-ছাগলের মত ঘাড় পেতে দেওয়া!

কিন্তু রাখে হরি মারে কে! আর মরলে এই গল্পই বা লিখতো কে? এতক্ষণ ঝড় চলছিল, এবার দেখতে দেখতে বিপদাপন্ন সন্তানের মায়ের অশ্রুধারার মত বড় বড় ফোঁটায় নেমে এল বৃষ্টি। আর আকাশের আঙ্গিনায় সেই মায়েরই বিদ্যুৎ-প্রদীপ ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠেই নিভে যেতে লাগল।

হঠাৎ সোমনাথ চীৎকার করে উঠল, ওই যে গফুর, ওই যে ঘাট!

বিদ্যুতের চকিত আলোয় আমরা সবাই দেখতে পেলাম, নৌকোর থেকে শ'পাঁচেক গজ তফাতে ঘাট না হলেও ঘাটের মত একটা কিছু তীরের জঙ্গল থেকে গড়িয়ে নদীগর্ভে নেমে এসেছে। শুধু তাই নয়, সেই সোপানশ্রেণীর ভগ্নাবশেষের ঠিক ওপরেই বিশাল এক প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল।

বললাম, কষে হাল ধরো গফুর, আমরা দাঁড় বাইছি—চলো ওই ঘাটে।

কিন্তু আশ্চর্য! লম্বা-চওড়া অতবড় সা-জোয়ান লোকটা হাল ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে চোখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে পাটাতনের ওপর বসে পড়ল।

প্রশ্ন করলাম, কি হলো গফুর?

ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় গফুর বলে উঠল, হায় আল্লা! ও যে পাশা-নগরের ঘাট! ওখানে আমার বাপও যেতে পারবে না কত্তা।

কেন? কারণটা কি?

ডাইনীর হাতে জান্ দেবে কে কত্তা?

বিড় বিড় করে গফুর বোধ করি গাজীর নামই জপ করতে লাগল।

সামনে কূল পেয়ে অ-কূলে থাকতে আমরা তখন রাজী নই। বললাম, নদীর বুকে থাকলেও তো তুমি মরবে গফুর!

তবু ডাইনীর হাতে প্রাণ দিতে পারবো না!

ধমক দিয়ে বললাম, বাজে কথা রাখো গফুর! ডবল কেরায়া পাবে—চলো।

লাখ আশ্‌রফি দিলেও না।

লুকিয়ে আনা রিভলভার এবারে কাজ দিল।

গফুরের বুক লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলাম, ডাইনী না পিস্তল—কোন্‌টা তোমার পছন্দ গফুর?

বিবর্ণ মুখে গফুর শুধু একবার বললে, হায় আল্লা!

তারপর হালটা ধরে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিল সেই মায়ারহস্য ঘেরা, ইতিহাস হারানো অতীতের সাক্ষী পাশানগরেব ঘাটের দিকে।

পিস্তলটি গফুরের বুকের কাছে উঁচু কবে ধরাই রইল।

ঘাটই ছিল এক সময়। বড় বড় শ্বেত পাথরের খণ্ড দিয়ে বাঁধানো দীর্ঘ প্রশস্ত ঘাট। কিন্তু এখন ঘাটের অর্ধেক সিঁড়ি নদীগর্ভে ধ্বসে গিয়েছে। জোড় খুলে গেছে শ্বেত পাথরের, ফাঁকে ফাঁকে গজিয়েছে আগাছা, মাঝে মাঝে জমেছে শ্যাওলা।

এই পাশানগরের ঘাট!

নৌকো থেকে তিনজনের মধ্যে আমরা দু'জনে নামলাম। নামল না শুধু বুড়ো গফুর। অনেক বোঝালাম, কিন্তু ডাইনীর হাতে প্রাণ দিতে সে কিছুতেই রাজী নয়। আমাদের দিকে চেয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় সে শুধু বললে, আদাব! আল্লা তোমাদের রহম্ করুন কর্ত্তা।

তারপর খরস্রোতের মুখে তার নৌকো তারের মতো ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গফুর মাঝির সঙ্গে সেই আমাদের শেষ দেখা। ডাকিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে ঝড়ের রাতে অন্ধ নিয়তির হাতেই নিজেকে সঁপে দিল কিনা কে জানে!

চার ব্যাটারীর টর্চের আলোয় সাবধানে পা ফেলে ফেলে, ঘাট বেয়ে উঠলাম। ঘাটের মাথায় প্রকাণ্ড লম্বা চাতাল জংলা গাছের

ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। জঙ্গল ঠেলে টর্চের আলোয় খানিকটা এগোতেই যেখানে এসে পড়লাম, সেটা বিরাট একটা প্রাসাদের খিড়কীর দরজা বলে মনে হলো! লোহার পাত আঁটা ভারী কাঠের পাল্লা দুটো জন্মের মত বন্ধ। বহু আঘাতেও টলল না পর্যন্ত।

যাই হোক, খিড়কীর দরজা যখন আছে, তখন কোথাও না কোথাও সিংদরজাও থাকবে নিশ্চয়ই। টর্চ ধরে সেই বিরাট প্রাসাদ প্রদক্ষিণ সুরু করে দিলাম। আন্দাজ সওয়া মাইলটাক ঘোরবার পর সিংদরজা পাওয়া গেল। প্রাসাদের উপযুক্ত সিংদরজাই বটে! প্রায় দোতলা সমান উচু, তার উপরে নহবৎ-খানা। একদিন হয়তো —কতদিন আগে জানি না—ওই সিংদরজা উদ্ধত স্পর্দ্ধায় আকাশকে হাতছানি দিত, ভগ্নচূড়া ওই নহবৎখানা থেকে প্রহরে প্রহরে বাজত রাগ-রাগিণীর আলাপ—রাত্রি শেষে টোড়ী, দু'প্রহরে মূলতান, গোধূলীতে পূরবী, মধ্যরাত্রে বেহাগ বা দরবারী।

বড় বড় লোহার গুলি মারা বিশাল কাঠের পাল্লা দুটোর একটা এখন ধরাশায়ী হয়েছে, আর একটা জীর্ণ কব্জায় ভর করে ধরাশায়ী হবার অপেক্ষায় রয়েছে!

সম্মুখ দিকটা বোধ করি কাছারী-সেরেস্তা ছিল, অতি পুরাতন পাতলা ইটের স্তূপ দেখে এখন আর বোঝবার উপায় নেই। মাঝখান দিয়ে শ্বেতপাথরে বাধানো অন্দরে যাবার চওড়া চলন-পথ। সেই পথ দিয়ে আমরা এসে পড়লাম মস্ত বড় একটা চত্বরে—কোমর অবধি উচু জংলী ঘাসে ভর্তি। এতক্ষণে বুঝলাম জায়গাটার নাম পাশানগর কেন।

সমচতুষ্কোণ এই চত্বরের চারিদিকে চারিটি লম্বা মহল ঠিক পাশার ছকের অনুকরণে তৈরী। হয়ত সেই কারণেই এর নাম পাশানগর। অথবা জায়গাটার নাম পাশানগর বলেই ওর চার মহলা প্রাসাদ হয়ত পাশার ছকের অনুকরণে তৈরী। চারটি মহলের তিনটিকেই এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। শুধু যে

মহলটি প্রাসাদের পিছন দিকে একেবারে মেঘনার ওপরে গিয়ে শেষ হয়েছে, একমাত্র সেই মহলটিই কেমন করে জানি না মহাকালের আঘাত উপেক্ষা করেও এখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি দোতলায় শ্বেতপাথরের বারান্দার রেলিং পর্যন্ত এতটুকু চিড় খায়নি!

সোমনাথ বললে, ভগবান না মেনে উপায় নেই দেখছি! এই মহলটা বোধ করি আমাদের আশ্রয় দেবার জন্যেই এখনও খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। চল্ ভেতরে—

যদিও মেঘনার তীরে বাঘের বাসা নেই, তবুও একতলার অন্ধকার ঘরগুলো উদ্বাস্তু অজগরদের বাসা হওয়াও বিচিত্র নয়। সামনেই চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ির মাথায় চওড়া বারান্দা দু'পাশে চলে গেছে। দু'পাশে দু'টো দু'টো চারটে কামরা তালাবন্ধ। শুধু মাঝখানের বড় ঘরটার দরজা হাট করে খোলা।

ঘরটা রীতিমত বড়। মেঝেয় বহু পুরাতন শতচ্ছিন্ন একখানা কার্পেট বিছানো। একপাশে প্রকাণ্ড একখানা পালঙ্ক এখনও অটুট অবস্থায় রয়েছে! পুরু গদীর ওপর ধুলায় ধূসর একখানা জাজিম পাতা। ঘরের মাঝখানে শ্বেত পাথরের গোল টেবিল। এক কোণে কারুকার্য করা ভারী দেরাজ এককালে হয়ত মেহগনী কাঠের ছিল, এখন দেখে বোঝবার উপায় নেই। বড় চওড়া আর্শিখানা সদ্য বিধবার হৃদয়ের মত চৌচির হয়ে ফাটা।

চারিপাশে চোখ বুলিয়ে সোমনাথ বলে উঠল, বাঃ বাঃ, এ তো রাজকীয় ব্যাপার দেখছি রে! দিব্বি সাজানো ঘর, গদীআঁটা পালঙ্ক —খোঁজ করলে চাই কি গাওয়া ঘিয়ের পোলাও-মাংসও মিলে যেতে পারে।

হেসে বললাম, তা যদি মিলে যায়, তাহলে এই পাশানগরের ডাইনীরা অতিশয় অতিথিবৎসলা, এ কথা স্বীকার করতেই হ'বে। হাজার হোক বাংলা দেশের ডাইনী তো!

একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে সোমনাথ বললে, তোর ওসব রসিকতা

এখন মোটেই ভাল লাগছে না শঙ্কর। পালঙ্কটা ঝেড়েঝুড়ে বরং শোয়ার বন্দোবস্ত করা যাক।

কাঁধের কিটব্যাগটা নামিয়ে রেখে বললাম, তার আগে দু'একখানা শুকনো কাপড় মেলে কিনা দেখা যাক। ঝড় বৃষ্টিতে একেবারে আলুভাতে হয়ে গেছি!

কিটব্যাগের ভেতর থেকে খানকতক শুকনো কাপড় বেরোল। আর বেরোল বড় একটা মোমবাতি আর বিস্কুটের বাক্স। সোমনাথের হাতে বাক্সটা দিয়ে বললাম, পোলাও মাংস সবে চড়েছে, আপাততঃ এইগুলোই চিবিয়ে তোমার পিত্ত রক্ষা করো।

বাইরে তখন ঝড, বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ সমানে চলেছে। ঝড়ের গোঙানীর সঙ্গে মেঘনার খল্ খল্ অট্টহাসি শোনা যায়। জানালাগুলো বেশ করে এঁটে দিয়ে শ্বেত পাথরের গোল টেবিলটার ওপরে মোমবাতিটাকে জ্বালিয়ে দিলাম। তারপর সঙ্গীকে বললাম, তুই শুয়ে পড়, আমি রইলাম জেগে।

সোমনাথ হাতঘড়িটা দেখে বললে, রাত বেশী হয়নি, একটা নাগাদ আমাকে তুলে দিস, আমি জাগব 'খন।

একে সারাদিনের পথের ক্লান্তি, তার ওপর প্রকৃত এই দুর্যোগে বিপর্যস্ত। ঘুমে ডুবে যেতে ওর দেরী হলো না। একা বসে বসে আমারও দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছিল। চোখ থেকে ঘুম তাড়ানোর জন্যে পায়চারী সুরু করে দিলাম।

ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে মেঝের কার্পেটের ওপর একটা অদ্ভুত বস্তু নজরে পড়ল। হাতে করে কুড়িয়ে নিলাম। দু'টুকরো হয়ে ভাঙ্গা, মেয়েদের হাতের একগাছা শাঁখা! দেরাজের ওপরেও আর একটি বিচিত্র জিনিস চোখে পড়ল। কারুকার্য করা একটি রূপার শূন্য সিঁদুর-কৌটা!

একদা এই শঙ্খ যার কোমল করকমলে শোভা পেত, রূপার ওই সিঁদুর কৌটো একদা যে সীমন্তিনীর সীঁথি অনুরাগে রাঙিয়ে তুলত,

ইতিহাসের পাতায় তার নাম লেখা নেই, কিন্তু আজকের এই অদ্ভুত ঘটনাচক্রে আমি তাকে দেখেছি। দেরাজের ঠিক ওপরেই পরমাসুন্দরী এক তরুণীর একখানা বড় তৈলচিত্র বাঁকা হয়ে ঝুলছে। এই শাঁখা, এই সিঁদুর-কৌটোর অধিকারিণী ছিল হয়ত ওই মেয়েটিই।

কল্পনাপ্রবণ মানুষ আমি নই, তবু এই হানাবাড়ীর ঘরে আজকের ওই মায়াময়ী নিশীথরাত্রি আমার ওপর হয়ত প্রভাব বিস্তার করেছে। ছবি কি জ্যান্ত হয়? মনে হলো ওই ঘন কালো আঁকা চোখ দুটি কি এক বেদনায় টলমল হয়ে উঠেছে! পদ্মকোরকের মত ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে থর্ থর্ করে। কত দিন, কত মাস, কত বর্ষের অসহ্য নীরবতার পর ও যেন আজ কিছু বলতে চায়।

কি সে কথা? সে কি এই জনহীন প্রেতপুরী পাশানগরেরই রহস্য-কাহিনী? জীবন-বসন্তের কত স্বপ্ন, ফল্গুর মত গোপন কত বেদনা, মুকুলিত যৌবনের কত আশা, ভগ্ন হৃদয়ের কত দীর্ঘশ্বাস—ইতিহাস যা অবজ্ঞা করে ভুলে গেছে, ও কি তারই কাহিনী আজ আমায় শোনাতে চায়?

ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আত্মবিস্মৃতের মত বলে উঠলাম, বলো, বলো, কি তুমি বলতে চাও আজ, বলো! এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে, মেঘনা পার হয়ে আমি যে তোমারি কথা শোনবার জন্যে আজ এসেছি!

জলভরা মেঘের মতই টলমল করে উঠল ছবির আয়ত চোখ দুটি, স্ফুরিত হয়ে উঠল পাতলা অধরোষ্ঠ। সমস্ত দেহ-মন আমার কান পেতে রইল—বলবে, এবার সে বলবে—

ঠিক সেই মুহূর্তে এই ভগ্ন প্রাসাদের কক্ষ থেকে বিকট স্বরে ডেকে উঠল একটা তক্ষক—বুক চাপড়ানোর মত আওয়াজ করে খুলে গেল একটা জানালা—আর মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের মত হু হু করে ঢুকে এল ঝোড়ো হাওয়া। সেই হাওয়ায় সজোরে দুলে উঠল দেওয়ালের ছবিখানা, আর চকিতে নিবে গেল মোমবাতির শিখা।

অন্ধকারে হতচেতন হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ মনে হলো, আমার আশেপাশে সেই জমাট অন্ধকার রাশি রাশি কুয়াশার মত গলে গলে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে সিনেমার 'ডিজল্ভ'-এর মত এক দৃশ্য মুছে গিয়ে আর একটি দৃশ্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দেখলাম সেই ঘর, চমৎকার করে সাজানো। সেই দেরাজটা ঝক্ ঝক্ করছে, তার উপরে মীনা করা প্রকাণ্ড একটি রূপার ফুলদানিতে একরাশ চন্দ্রমল্লিকার সমারোহ। একটি ফুলদানী উজ্জ্বল আর্শির সামনে ঘটো হয়েছে। পালঙ্কের উপর বিচিত্র নক্সা-করা একটা রেশমী জাজিম বিছানো। তারই উপর বসে, পালঙ্কের বাজুতে একখানা বড় ছবি হেলান দিয়ে রেখে, প্রিয়দর্শন একটি যুবক একমনে ছবি আঁকছে। তার সামনে লম্বা দাঁড়া-শামাদানে বড় বড় তিনটে মোমবাতি জ্বলছে, পাশে হাতের কাছে সেই শ্বেত পাথরের গোলাকার টেবিলের ওপর নানান্ রঙের পাত্র আর একগোছা তুলি।

সেই ছবি! একটু আগে দেরাজের ভাঙ্গা আর্শির ঠিক উপরে বাঁকা করে ঝোলানো যে তৈলচিত্র দেখেছিলাম, সেইখানাই।

তরুণবয়সী সেই ছেলেটি ছবিখানির উপর একবার করে তুলির টান দেয় আর ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। স্বপ্নময় দুই চোখে শিল্পীর তন্ময়তা। কিন্তু শুধুই কি তাই? প্রেমের মদিরতাও কি তার সঙ্গে মিশে নেই?

কে এই যুবক? কার ছবি সে আঁকছে? এ কার বাড়ী? সময়ের উজান-স্রোত বেয়ে অতীতের কোন্ ঘাটে এসে ঠেকেছি, কিছুই জানি না। শুধু মনে হলো, কোন অদৃশ্য যাদুকর চোখের সামনে যেন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে!

ঘরের পিছন দিকে বারান্দার খিলানের ফাঁকে সপ্তমীর চাঁদ হেলে পড়ছে। দেউড়ীর পেটা ঘড়িতে তিনটে বাজল।

হঠাৎ ঘরের বাইরে চলন-পথে কার যেন লঘু পায়ের আওয়াজ।

পরমুহূর্তেই এক ঝলক হাওয়ার মত যে এসে ঘরে ঢুকল, তার দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। ছবি কোনটা? পালঙ্কের বাজুতে হেলান দিয়ে রাখা ওই মূর্তি? না মেঝের ওপর দাঁড়ানো স্খলিত বিদ্যুৎলতার মত এই মূর্তিটি?

দুটি মূর্তি হুবহু এক।

যুবকটির হাত থেকে তুলি খসে পড়ল। মুখ দিয়ে শুধু বেরোলো, কঙ্কণা? তুমি!

মুখের ওপর থেকে মেয়েটি পাতলা নীলাম্বর ওড়নাখানা সরিয়ে দিল। শান্ত গলায় বললে, চিনতে ভুল হচ্ছে?

না, ভুল হয়নি। ভেবেছিলাম তুমি আর—

কোনদিনই আসব না, এই তো?

মুক্তার মত দাঁত দিয়ে মেয়েটি তার রক্তাক্ত অধর একবার চেপে ধরল। তারপর বললে, পুরুষেরা এমনিই ভাবে। তবু আমাকে আসতে হলো।

কিন্তু এত রাত্রে!

ঘরের মাঝখান থেকে মেয়েটি এগিয়ে এল শ্বেত পাথরের টেবিলটার কাছে। কথা বলতে গিয়ে আবেগে তার গলা কেঁপে গেল: লুকিয়ে এসেছি। না এসে আমার উপায় ছিল না বিক্রম!

পালঙ্ক থেকে নেমে বিক্রম মেয়েটি পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বললে, কেন? কেন কঙ্কণা? কি হয়েছে?

শুধু একটা খবর তোমায় জানাতে এলাম। কাল গোধূলিলগ্নে আমার বিয়ে!

বিয়ে? কার সঙ্গে?

রায়পুরের জমিদারের ঘরে।

বিক্রমের ঝুঁকে পড়া দেহটা হঠাৎ সোজা হয়ে গেল। চোখে তাকিয়ে রইলো কঙ্কণার দিকে। যেন সে কঙ্কণার মধ্যে বহুদূরে আর কাউকে দেখছে!

এ কোন্ নাটকের কোন্ দৃশ্যে আমি এসে পড়েছি, কে জানে! কোন্ অঙ্কে সুরু হয়েছিল, কোন্ অঙ্কে শেষ হবে, তাও জানি না। কিন্তু নাটকের নায়ক-নায়িকা—তারাও কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে না?। আশ্চর্য?

স্তব্ধতা ভেঙ্গে কঙ্কণা বলে উঠল, চুপ করে আছো কেন?

কি বলব বলো?

কিছুই বলবার নেই তোমার?

আস্তে আস্তে বিক্রম বারান্দার খিলানের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল, যেখানে সপ্তমীর চাঁদ দিগন্ত-সীমায় একেবারে হেলে পড়েছে। তারপর মৃদু গলায় বললে, রায়পুরের ঘরে গিয়ে আমাকে ভুলে যেতে চেষ্টা কোরো।

কঙ্কণার সারাদেহ একবার কেঁপে উঠল। রুদ্ধ আবেগে বলে উঠল, এই কথাই যদি বলবে, তবে তখন বলনি কেন—যখন আমি সাত বছরের বালিকা ছিলাম. যেদিন দোল-পূর্ণিমার রাত্রে মেঘনার ঘাটে দাঁড়িয়ে আমার সীঁথিতে আবির দিয়েছিলে?

শামাদানের দিকে পিছন করে কঙ্কণা ঘুরে দাঁড়ালো। তবু মনে হলো, তার দুটি গালে যেন অভ্রের গুঁড়ো চিক্ চিক্ আমার করছে।

নিঃশব্দে টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে বিক্রম গিয়ে দাঁড়ালো দেরাজের কাছে। তারপর ফুলদানী থেকে একটি চন্দ্রমল্লিকা তুলে নিয়ে তার পাপড়িগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলতে লাগল, সেদিন এদিন ছিল না কঙ্কণা। সেদিন তুমি ছিলে আমার বাগদত্তা। কিন্তু সময়ের চাকা গেল ঘুরে। মেঘনার একটি চর নিয়ে রূপনগরের জমিদার তোমার বাবা দর্পনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে পাশানগরের জমিদার আমার বাবা ইন্দ্রজিৎ রাওয়ের লাগল বিরোধ! এক আধ বছর নয়, দশ বছর ধরে চললো সেই বিরোধের জের। কত দাঙ্গা, কত খুন, কত মামলা! দশ বছর পরে মেঘনার সেই চর গেল ভেসে। আমার বাবার হ'লো মৃত্যু। তবু পুরাতন শত্রুতার দাগ তোমার বাবার বুক থেকে আজও

মছলো না।

ছিন্ন ফুলের পাপড়িগুলো ঘরময় ছড়িয়ে ফেলে বিক্রম আবার বলতে লাগল, একদিন তোমার বাবা আর আমাব বাবা ছিলেন পরম বন্ধু। পরম বন্ধু যখন পবম শত্রু হতে পারে, তখন বাগদত্তা বধ্ যে পবের ঘরণী হয়ে যাবে, এতে আশ্চর্য হ'বাব কিছু নেই কঙ্কণা।

অস্থির ভাবে কঙ্কণা বলে উঠল, তবু এ বিয়ে তোমাকে বন্ধ করতেই হ'বে বিক্রম।

কিন্তু কেমন কবে তা সম্ভব? দর্পনারায়ণ চৌধুবী শত্রুপক্ষেব ছেলের হাতে মেয়ে দেবেন না, এ কথা তুমি ভাল কবেই জানো কঙ্কণা।

তা জানি। কিন্তু তোমাব কিছুই কি করবার নেই?

যা আছে, তা আমি করতে পারব না কঙ্কণা। জমিদার ইন্দ্রজিতের সন্তান শত্রুর কাছে কখনও হাত পাতে না। তার চেয়ে আমি বলি কি, নিয়তিকে মেনে নিয়ে রায়পুরের পথেই পা বাড়ানো তোমার পক্ষে ভাল।

আর তুমি?

যেন স্বপ্নে কথা কইছে, এমনিভাবে বিক্রম বললে, আমারও দিন কেটে যাবে—নতুন করে তোমার ছবি এঁকে, আর পুরোনো স্মৃতি নিয়ে খেলা করে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কঙ্কণা বলে উঠল, আচ্ছা বিক্রম, শুনেছি, তোমার পূর্বপুরুষেরা নারী-বিলাসী ছিলেন। সুন্দবী স্ত্রীলোক দেখলেই তাঁরা জোর করে ধরে রাখতেন।

বিক্রমের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো।

আমিও শুনেছি, কিন্তু একথা কেন?

এক ঝট্‌কায় ঘুরে দাঁড়ালো কঙ্কণ। শিথিল হয়ে খসে পড়ল তার বুকের আঁচল। শামাদানের পরিপূর্ণ আলো পড়ল তার চোখে, তার মুখে, তার তরঙ্গায়িত বুকে। আয়ত চোখে মদালস কটাক্ষ হেনে লতার মত লীলায়িত বাহু মেলে বিক্রমের দিকে এগিয়ে

যেতে যেতে মধুর কণ্ঠে বলতে লাগল, আমিও তো সুন্দরী, বিক্রম—লোকে বলে, মেঘনার এপারে আমার রূপের আর জুড়ি নেই! আর তুমিও তো সেই পাশা-নগরের পূর্বপুরুষদের বংশধর! আমায় তুমি ধরে রাখতে পার না বিক্রম? পারো না আটকে রাখতে?

মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত হয়ে গেল বিক্রম। কামনার ইঙ্গিতে দুই চোখ তার উঠল ঝল্‌সে। হয়ত পলকের জন্যে শিরায় শিরায় চঞ্চল হয়ে উঠল তারই পূর্বপুরুষের রক্ত।

আর এক মুহূর্তে পরে কি ঘটত কে জানে! এক গুচ্ছ সদ্য ফোটা রজনীগন্ধা ঝড়ের আঘাতে হয়ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেত। এক স্তবক আঙুর কামনার নিষ্পেষণে দলিত মথিত হয়ে, হয়ে উঠত একপাত্র সুরা!

কিন্তু দেখলাম, ধীরে ধীরে বিক্রমের ভঙ্গী সহজ হয়ে এল। ক্ষীণ হেসে বললে, ধরে রাখতে তোমাকে পারতাম কঙ্কণা, যদি না তোমাকে ভালবাসতাম!

তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল কঙ্কণা, থামো, থামো, বিক্রম, ভালবাসার কথা আর মুখে এনো না! যে ভালবাসা প্রেমাস্পদকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ভয়ে ছেড়ে দেয়—যে ভালবাসা জ্যান্ত মানুষ ছেড়ে ছবি নিয়ে দিন কাটায়, সে ভালবাসাকে দর্পনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে ঘৃণাই করে। ছি ছি ছি, আজ আমার লজ্জার সীমা নেই! নারীত্বের এত বড় বিপদ নিয়ে আমি কার কাছে ছুটে এসেছি? একটা ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রীলোকেরও অধম যে, তারই কাছে?

আহত কণ্ঠে বিক্রম বলে উঠল, মুখ বন্ধ করো কঙ্কণা! তুমি কি আমাকে অপমান করতে এসেছো?

একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা দিল কঙ্কণার ওষ্ঠপ্রান্তে। বললে, না এসেছি আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাতে। যদি সাহস থাকে, নিমন্ত্রণ রক্ষে করতে যেও।

এক ঝট্‌কায় স্খলিত আঁচল বুকের ওপরে তুলে নিয়ে, কঙ্কণা আবার এক ঝলক হাওয়ার মতই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একা ঘরে দাঁড়িয়ে বিক্রম কি যেন ভাবলে। দুই চোখ জ্বলে উঠল ধ্বক্ করে। দেখতে দেখতে তার নগ্ন গায়ের পেশীগুলো পাথরের মত শক্ত হয়ে ফুলে উঠল।

হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে বিক্রম ডাকলে, দাঁড়াও কঙ্কণা—

নিঃশব্দে বিক্রমকে আমি অনুসরণ করলাম।

চলন-পথ পার হয়ে কঙ্কণা তখন সিঁড়ির পথে পা দিয়েছে! সে ঘুরতেই বিক্রম এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার মুখোমুখি। শান্ত গম্ভীর গলায় বললে, একটা কথা শুনে যাও। বাপ-মা আমার বিক্রমজিৎ নাম বৃথাই রাখেন নি। কাল গোধূলি-লগ্নে আমি তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব।

দীর্ঘায়ত দুই চোখ মেলে কঙ্কণা ক্ষণকাল বিক্রমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল! তারপর কবরী থেকে একটা রক্ত গোলাপ খুলে নিয়ে, বিক্রমের পায়ের ওপর রেখে দিয়ে দ্রুত নেমে গেল।

দেউড়ির পেটা ঘড়িতে তখন চারটে বাজছে।

ফুলটা হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বিক্রম ডাক দিলে, রাঘব! রাঘব!

নীচের অন্ধকার চত্বর থেকে একটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে উপরে উঠে এল!

বিক্রম বললে, ঘরে চলো।

বিক্রমকে অনুসরণ করে ছায়ামূর্তির সঙ্গে আমিও আবার ঘরে এসে ঢুকলাম। শামাদানের আলোয় ছায়ামূর্তিটিকে এবার স্পষ্ট দেখা গেল। লম্বায় ছ'ফুট। মিশমিশে কালো দেহ যেন কালো ইস্পাত দিয়ে তৈরী। মাথায় পেঁজা তোলার মত ধবধবে বাবরী চুল, সাদা গালপাট্টা কান অবধি নেমে এসেছে। মুখে তেমনিই সাদা একজোড়া পাকানো গোঁফ। সাদা-কালো ছাড়া তার মুখের মধ্যে আর একটি রঙ ছিল—সে হচ্ছে তার লাল টকটকে চোখ দুটো।

বিক্রম প্রশ্ন করলে, আমাদের পাইক-দলে ক'জন লাঠিয়াল আছে, রাঘব?

হাত কচলে রাঘব বললে, একথা তো আজ তিন বছর শুধোন নি ছোট কত্তা ?

দরকার হয় নি, তাই। তুমি ছাড়া ক'জন আছে ?

আছে তো জনা তিরিশ, কিন্তু পাকা হাত জনা পনেরোর বেশী হবে না।

তাহলেই চলবে। কাল সূর্যাস্তের সময় তোমরা তৈরী থেকো। আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কোথায় যেতে হ'বে ছোট কত্তা ?

রূপনগরের জমিদার-বাড়ী।

রাঘবের লাল চোখ দুটোতে কৌতূহলের ঝিলিক দেখা গেল।

বটে, বটে! দর্পনারাণ চৌধরীর বাড়ী ? কেনে ?

ধীর গম্ভীর গলায় বিক্রম বললে, আমার বৌ আনতে।

রাঘবের পুরু কালো ঠোটের অন্তরাল থেকে ঝক্‌ঝকে দু'পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল! পোষা নেকড়ের হাসির মত তার হাসি। হাসি মুখে রাঘব বলে উঠল, আঃ, তিন বছর বসে থেকে গা-গতরে যেন মরচে ধরে গিয়েছিল! কত দিন যে রাঘব লেঠেলের লাঠি ভোমরার মত ডাক ছাড়েনি! কি আনন্দ হচ্ছে ছোট কত্তা! তারা! তারা!

দু'হাত জোড় করে হেঁট হয়ে কপালে ঠেকিয়ে রাঘব চলে গেল।

হাতের মুঠোয় সেই রক্ত গোলাপটি নিজের ওষ্ঠাধরে একবার ছুঁইয়ে বিক্রম অস্ফুট স্বরে বারম্বার বলতে লাগল, কঙ্কণা! কঙ্কণা!...

আর দেখতে দেখতে শামাদানের সেই তিনটি জ্বলন্ত মোম-বাতির শিখা বার কয়েক দপ্‌ দপ্‌ করে উঠেই নিভে গেল। অন্ধকার ঘরময় শুধু নিবন্ত শিখার সাদাটে ধোঁয়ার রেখা আঁকাবাঁকা সাপের মত ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকাতে লাগল।

আবার সেই আঁকাবাঁকা সাদা ডোরা-কাটা অন্ধকারের পর্দা গলে' গলে' যাওয়া—আর তারই ফাঁকে ফাঁকে আর এক নতুন দৃশ্য ফুটে ওঠা। ঘুর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে যেমন করে' দৃশ্যপট বদলে যায়।

সেই ঘর! হাজার বাতির ঝাড়ের আলোয় ঘরের ভেতরটা দিন হয়ে গেছে। পালঙ্কের ওপর পাশাপাশি ত্বটো ভেলভেটের বালিশ, অজস্র শ্বেতপদ্ম আর রক্ত গোলাপ দিয়ে সারা বিছানায় যেন ফুলের আল্পনা দেওয়া। পালঙ্কের বাজুতে আর ছত্রিতে মাতিয়া বেলের মালা তুলছে।

কিন্তু এ পুষ্পবাসর যাদের জন্যে রচনা হয়েছে, তারা কই?

ঘরের মেঝেয় আল্পনা দেওয়া, তারই ওপর পাতা দু'খানি নক্সাকাটা পশমের আসন। আর তারই সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন শুভ্রকেশ, গৌরবর্ণ বৃদ্ধ পুরোহিত। দুই চোখে শান্ত প্রতীক্ষা।

শুধু দরজার বাইরে সেই চলন-পথে জনকয়েক দাস-দাসীর ব্যস্ত আনাগোনা।

দেউড়ীর নহবৎখানা থেকে ভেসে-আসা ইমন কল্যাণের আলাপ গোধূলির আকাশকে উদাস করে তুলেছে।

সবটা মিলিয়ে আকাশে-বাতাসে যেন একটি রুদ্ধনিশ্বাস অপেক্ষার আভাস।

কার অপেক্ষা? কে আসবে আজ পাশানগরের এই রহস্য পুরীতে? কে?

হঠাৎ নহবতের আলাপ ছাপিয়ে বেজে উঠল শাঁখ আর উলুধ্বনির আওয়াজ। চমকে উঠতেই দেখি, দরজা দিয়ে ঢুকছে বিক্রম। তার ডান হাতে রূপোর বুটি দেওয়া চক্‌চকে পাকা বাঁশের একগাছি লাঠি, আর বাঁ-হাতখানা ধরে আছে কঙ্কণার ডান হাতের ছোট মুঠি। কঙ্কণার পরণে রূপালী কাজকরা কাঠগোলাপ রঙের বেনারসী। গালে আর কপালে চন্দনের ফোঁটা, পায়ে আলতা, মাথায় সীঁথিমৌর। নববধূবেশ!

কিন্তু এ কি মূর্তি বিক্রমের? পরণে গরদের জোড়া মালসাট দিয়ে পরা। শুভ্র ললাট শ্বেতচন্দনের সঙ্গে কাঁচা রক্তে মাখা-মাখি। আর সেই রক্তেরই ধারা গড়িয়ে এসে তার সুগঠিত চওড়া বুকের ওপরে

বেলফুলের গোড়ে মালাকে রাঙিয়ে তুলেছে।

একি অদ্ভুত বরবেশ বিক্রমের ? তবু মনে হলো, পৌরুষ যে এত সুন্দর হয়, আগে, তা জানা ছিল না।

কঙ্কণাকে একখানা আসনে বসিয়ে, নিজে আর একটাতে বসে পড়ে বিক্রম বললে, লগ্নের আর দেরী নেই, মন্ত্র পড়ান শাস্ত্রীমশাই।

বৃদ্ধ পুরোহিত নিজের আসন গ্রহণ করলেন। দরজার বাইরে আবার বেজে উঠল শঙ্খ আর উলুধ্বনি। সুরু হয়ে গেল বিবাহের মন্ত্রোচ্চার।

দেউড়ীতে নহবৎ তখন ধরেছে পুরিয়া ধানেশ্রী।

দেরাজের পাশে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখছিলাম। বিক্রম আর কঙ্কণা—সংস্কৃত কাব্যে হরগৌরীর যে মিলনের কথা পড়েছি, এ যেন তাই। বিক্রমের নির্ভীক মুখে উত্তেজনাব রেশ তখনও রয়েছে। চোখ দুটি কিন্তু প্রশান্ত। আর কঙ্কণার মুখে প্রথম লজ্জা ও অনুরাগের আরক্ত আবেশ। কিন্তু উৎকণ্ঠিত চোখের দৃষ্টি তার বারবার গিয়ে পড়ছে বিক্রমের আহত কপালের ওপর—যেখানে শ্বেতচন্দন আর লাল রক্তে একাকার হয়ে গেছে।

ভাবছিলাম এ কি করে সম্ভব হলো ? দর্পনারায়ণ চৌধুরী তো প্রাণ গেলেও শত্রুপক্ষের ছেলের হাতে মেয়ে দেবেন না ? তবে ? চকিতে মনে পড়ে গেল গত রাত্রে বিক্রমের সেই কথা : কাল গোধূলি লগ্নে আমি তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব কঙ্কণা। মনে পড়ল পোষা নেকড়ের মত রাঘব লেঠেলের সেই হাসি ! 'কতদিন যে আমার লাঠি ভোমরার মত ডাক ছাড়ে নি ! কি আনন্দই হচ্ছে ছোট কত্তা !'

ভয়ঙ্কর একটা আশঙ্কায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। তবে কি—

কিন্তু ভাবনার আর অবকাশ রইল না। নহবতের সুরের জাল হঠাৎ গেল ছিঁড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা কোলাহল। মনে হলো, আওয়াজটা আসছে দেউড়ীর দিক থেকেই।

বিয়ের আসনে বসে চঞ্চল হয়ে উঠল বিক্রম। দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে কাউকে ডাকবার আগেই দরজার গোড়ায় যে এসে দাঁড়াল,

তার মুখখানা দেখে প্রথমটা চিনতে পারিনি। থ্যাতলানো কালো মুখখানা কাঁচা রক্তে যেন সিঁদুর মাখানো। সাদা চুল রক্তে জড়িয়ে জট্ বেঁধেছে। চিনতে পারলাম শুধু ছ'ফুট লম্বা কালো দেহ আর সাড়ে ছ'ফুট লম্বা হালের তেল-পাকা লাঠিগাছটা দেখে।

তার দিকে চেয়ে বিক্রম প্রশ্ন করলে, দেউড়ীতে কিসের আওয়াজ রাঘব? কে এলো?

ঝক্‌ঝকে দাঁত বার করে রাঘব আর একবার হাসল। বললে, যে আসবার সেই এসেছে ছোট কত্তা! দর্পনারাণ চৌধুরী!

কে?

দর্পনারাণ চৌধুরী গো! সঙ্গে পঞ্চাশটা লেঠেল। আসবে না? বাঘের গর্ত থেকে তুমি তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে আনলে, আর সে চুপ করে বসে থাকবে? তাই তৈরী হয়েই এসেছে।

বিক্রমের শরীরের প্রত্যেকটা পেশী কঠিন হয়ে ফুলে উঠল। কিন্তু কণ্ঠে এতটুকু উত্তেজনা প্রকাশ পেলো না। শান্তগলায় শুধু বললে, আমি যাচ্ছি।

দুই বাহু দিয়ে রাঘব দরজা আটকে ধরলো।

দোহাই ছোট কত্তা, বিয়ে শেষ না করে যদি ওঠো তো বড় কত্তার দিব্বি লাগবে। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো গো! রাঘব লেঠেলের শরীরে এখনও অনেক রক্ত আছে। তাই দিয়ে আজ নিমকের দেনা শুধতে পারব।

তারপর শাস্ত্রীমশায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, বাবাঠাকুর বাকি মন্তর ক'টা একটু চটপট পড়িয়ে দাও। আমি ততক্ষণ দেউড়ী আগলাই।

লাঠিতে ভর করে নেকড়ের মত লাফ দিয়ে চলে গেল রাঘব। সন্ধ্যার আকাশকে বিদীর্ণ করে শোনা গেল তার ভাঙা গলার ভয়াবহ চীৎকার, রে-রে-রে-রে-রে-রে—

ঘরের মধ্যে শাস্ত্রীমশায়ের মন্ত্রোচ্চার দ্রুত হয়ে উঠল। আর তারই প্রতিধ্বনি করে চলল বরকন্যার আবেগময় কণ্ঠস্বর।

থেমে গেছে পুরিয়া-ধানেশ্রীর আলাপ। শঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে গেছে শঙ্খ আর উলুধ্বনি। ঘরের মধ্যে সম্প্রদানের মন্ত্রোচার, আর বাইরে লাঠিয়ালদের হুঙ্কার।

দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে সমস্ত দেহ-মন আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। অপূর্ব এ বিবাহ অনুষ্ঠান জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে এই মিলন-লগ্ন!

সম্প্রদান তখন শেষ হয়ে এসেছে, বাধা পড়ল। ছুটে এলো একজন পাইক।

ছোট কত্তা!

কি খবর সনাতন?

দর্পনারায়ণ চৌধুরীর দল দেউড়ী পার হয়ে চত্বরে এসে পড়েছে।

এক মুহূর্তের জন্য বিক্রমের দেহ পাথরেব মত স্থির হয়ে রইল। হারিয়ে গেল মুখের মন্ত্র। পরক্ষণেই আরও দ্রুত হয়ে উঠল শাস্ত্রীমশায়ের মন্ত্রপাঠ। আর সেই পবিত্র মন্ত্রোচার ছাপিয়ে কানে আসতে লাগল নীচেকার মত্ত কোলাহল আর রাঘবের ভাঙা গলার ভৈরব হুঙ্কার: রে-রে-রে-রে-রে-রে—

এক নিঃশ্বাসে মন্ত্রোচ্চার শেষ করে শাস্ত্রীমশায় বিক্রমকে বললে, কন্যার সীমান্তে সিঁদুর দাও।

বিক্রম প্রশ্ন করলে, কুসনডিঙ্গার আগেই?

তা হোক! বৈদিক মতে অশাস্ত্রীয় হ'বে না। সম্প্রদান এবং গ্রহণই হলো আসল বিবাহ, সীমান্তে সিঁদুর দেওয়াটা তারই স্বাক্ষর।

সিঁদুরভরা রূপার কুনকেটা শাস্ত্রীমশাই বিক্রমের হাতে তুলে দিলেন। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে আছো, শাঁখটা একবার বাজাও!

কোনো সাড়া এলো না, কেউ বাজালো না শাঁখ। তার বদলে পাইকের মুখে এল মর্মান্তিক খবর, বিপক্ষ দলের লাঠির আঘাতে রাঘবের শিরদাঁড়া গেছে ভেঙে। ভাঙা শিরদাঁড়া দিয়ে রাঘব লেঠেল

তার বড়কত্তার নিমকের ঋণ শোধ করেছে!

বজ্রগর্ভ মেঘের মতই বিক্রম তখন স্থির। সীমন্তিনী কঙ্কণা গলায় আঁচল দিয়ে তাকে প্রণাম করে উঠতেই বিক্রম তার চোখে চোখ রেখে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর শুধু বললে, আমি আসছি, তুমি অপেক্ষা করো।

রূপোর বুটি দেওয়া লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে বিক্রম গিয়ে দাঁড়ালো চলন-পথের সেই সিঁড়ির মুখে। অনুসরণ করলেন শাস্ত্রীমশায়, অনুসরণ করলাম আমি।

গেল না শুধু কঙ্কণা।

পিছন ফিরে একবার দেখলাম, স্পন্দনহীন মূর্তির মতই কঙ্কণা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। ঘোমটা পড়েছে খসে, সীমান্তভরা রাঙা সিঁদুর হাজার বাতির ঝাড়ের আলোয় লাল আগুনের আভার মতই জ্বলছে!

নীচের চত্বরে যেন দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে!

খাস গেলাসের বাতি আর রঙীন কাঁচের ফানুসগুলো গুঁড়িয়ে চুরমার। থামে থামে দেয়ালে দেয়ালে সাজানো পাতা আর ফুলের ঝালর ছিন্নভিন্ন। অন্ধকারে শুধু শত্রুপক্ষের হাতে চার-পাঁচটা মশাল জ্বলছে।

সিঁড়ির নীচের ধাপের ওপর পড়ে রাঘব শিরদাঁড়াভাঙা কেউটের মতই কাৎরাচ্ছিল: পেছন থেকে চুপিসাড়ে এসে কোমরে চোট্‌ করে দিলে, নইলে কুটুমের খাতিরের বহরটা আজ একবার দেখিয়ে দিতুম চৌধুরী মশাই! তোমার পঞ্চাশ জনের তিরিশজন তো মাটি নিয়েছে। বাকী বিশজনের একজনকেও এই পাশানগর থেকে আর ফিরতে হতো না।

চোপ্‌রাও! দর্পনারায়ণ চৌধুরীর মুখের ওপর বেয়াদপি! বলতে বলতে দুই হাত পিছনে রেখে আহত রাঘবের মুখের সামনে এগিয়ে এলেন খর্বকায়, অত্যন্ত বলিষ্ঠ চেহারার এক প্রৌঢ় ব্যক্তি।

এই দর্পনারায়ণ চৌধুরী!

মশালের আলোয় ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, কাঁচা-পাকা বাবরী চুল সমেত তাঁর মাথাটাকে দেহের অনুপাতে প্রকাণ্ড দেখায়! মুখের রেখায় রেখায় উদ্ধত দাম্ভিকতার ছাপ। ধূর্ত চোখ দুটো মশালের আলোয় রাত্রে শেয়ালের চোখের মতই জ্বলছে!

রাগে মুখ কুটিল করে দর্পনারায়ণ রাঘবকে আবার বললেন, বিষ নেই, কুলোপানা চক্র! কুত্তার বাচ্চা!

ভাঙা গলায় হা হা করে হেসে রাঘব বললে, সাবাস্! তুমি বাপের মতই কথা বলেছো বটে চৌধুরী মশাই!

অপমানে জ্বলে উঠে দর্পনারায়ণ হাঁকলেন, কে আছিস্? হারামজাদকে বিশ পয়জার লাগা।

তাঁর দু'পাশ থেকে দু'জন পাইক এগিয়ে এলো নাগরা হাতে। কিন্তু মারা আর হলো না। সিঁড়ির ওপর থেকে মেঘের মত গম্ভীর আওয়াজ এলো, খবরদার!

দর্পনারায়ণ মুখ তুলে তাকালেন।

তেমনি শান্ত গম্ভীর গলায় বিক্রম প্রশ্ন করলে, কি চান আপনি?

মোটা কর্কশ গলায় দর্পনারায়ণ জবাব দিলেন, আমার মেয়ে কঙ্কণাকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বিক্রম বললে, কঙ্কণা এখন আমার স্ত্রী। ওইখান থেকেই তাকে আশীর্বাদ করে যান।

দর্পনারায়ণের মুখখানা রাগে বীভৎস হয়ে উঠল। চীৎকার করে তিনি বললেন, এ বিবাহ আমি মানি না, এ বিবাহ অসিদ্ধ।

বিক্রমের পেছন থেকে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ শাস্ত্রীমশাই। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, কে বলে এ বিবাহ অসিদ্ধ? বিবাহ দিয়েছি আমি—

চমকে উঠলেন দর্পনারায়ণ।

কে? তুমি? রামনাথ শাস্ত্রী—আমারই কুল পুরোহিত? কার হুকুমে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়েছ?

সত্য আর ন্যায়ের হুকুমে।

একটা বিশ্রী শব্দ করে হেসে উঠলেন দর্পনারায়ণঃ বটে, বটে। বেশ, বিবাহ যখন হয়েই গেছে, মেয়েকে আমার পাঠিয়ে দাও, সিঁদুর মুছে ফেলে থান পরিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যাই।

দুই কানে হাত চেপে শাস্ত্রীমশাই বলে উঠলেন, তুমি কি মূর্তিমান পিশাচ দর্পনারায়ণ? বাপ হয়ে তুমি—

চুপ করো শাস্ত্রী! বিয়ের সভা থেকে আমার মেয়েকে যে ডাকাতের মত জোর করে কেড়ে এনেছে, তার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েকে বিধবা সাজিয়ে ঘরে রেখে দেওয়াই ভাল।

স্থিরভাবে বিক্রম বললে, জোর করেছি আপনার ওপর, আপনার মেয়ের ওপর নয়। কঙ্কণা স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে এসেছে। আপনি তাকে আটকাতে পারেন নি—সে আপনারই অক্ষমতা।

মার্বেলের চত্বরে পা ঠুকে দর্পনারায়ণ চীৎকার করে উঠলেন, আমি আরেকবার জানতে চাই বিক্রম, কঙ্কণাকে তুমি ফিরিয়ে দেবে কিনা?

সিঁড়ির ওপর থেকে শান্ত দৃঢ় গলায় জবাব এলো, না।

দর্পনারায়ণের কণ্ঠ আর এক পর্দা চড়লঃ আমি তোমায় শেষবার বলছি বিক্রম—

আমিও শেষ জবাব দিয়েছি।

যদি জোর করে নিয়ে যাই, পারবে ঠেকাতে?

সেটা প্রমাণ হয়ে যাক।

বেশ, পারো তো ঠেকাও।

দর্পনারায়ণের ইঙ্গিতে চক্ষের নিমেষে চার-পাঁচজন লাঠিয়াল আহত রাঘবকে টপকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। বিক্রমের স্থির দেহটা একবার নড়ে উঠল মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, প্রথম লোকটা 'বাপ!' বলে একটা বস্তার মত সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তারপরে আর একজন। তারপরে আরও একজন।

দর্পনারায়ণের ইঙ্গিতে নীচ থেকে ছুটে গেল আরও চার-পাঁচজন —তারপর আরও পাঁচ-সাতজন।

সিঁড়ির মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছে একা বিক্রম। রূপোর গুল-বসানো হাতের লাঠিখানা আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। চক্রাকারে অবিরাম ঘুরছে! লাঠি যে ভ্রমরের মত ডাক ছাড়ে, জীবনে এই প্রথম শুনলাম।

তার সেই বিদ্যুৎগতি লাঠির সামনে শত্রুপক্ষের লাঠিয়ালেরা গুলি-খাওয়া নেকড়ের মত একের পর এক পড়তে লাগল!

কিন্তু এ কি পুষ্প-বাসর, না শ্মশান-বাসর? কোথায় গেল নহবতের আলাপ, শঙ্খ আর উলুধ্বনি? চতুর্দিকে ছিন্ন ফুল আর পাতার মাঝে পড়ে রাশি রাশি রক্তাক্ত দেহ। চোট্ খাওয়া লাঠিয়ালদের মৃত্যু-যন্ত্রণার আওয়াজে এ বাসর-রাত্রি যেন শিউরে উঠছে।

কে কবে দেখেছে এমন অদ্ভুত বিবাহ-বাসর?

সিঁড়ির মুখ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিক্রম। গলায় গোড়ে ফুলের মালা। কপাল রক্তে আর চন্দনে মাখামাখি। হাতের লাঠি ঘুরছে অবিরাম বিদ্যুৎগতিতে।

এই কি বর?

শিরদাঁড়া-ভাঙা রাঘব সিঁড়ির নীচ থেকে চীৎকার করে উঠল, সাথক তোমায় লাঠিধরা শিখিয়ে ছিলুম ছোটকত্তা! দু'চোখ আমার আজ জুড়িয়ে গেল। বলি চৌধুরীমশাই, বাপের বেটা হও তো পাশা-নগরের লাঠির নমুনাটা শুধু দেখে নয়, নিজেও একবার চেখে যাও।

পলক পড়ছে না দর্পনারায়ণের চোখে। দুই হাত পিছনে রেখে 'স্থর হয়ে তাকিয়ে আছেন সিঁড়ির মাথায়।

সিঁড়ির মাথার অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিক্রম। হাতের লাঠি দেখা যায় না। শুধু একটানা ধ্বনি চলেছে, খট্-খট্-খটা-খট্-খট্-খট্-খটা-খট্—

ভারী কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন দর্পনারায়ণ: সাবাস! ইন্দ্রজিৎ রাওয়ের ছেলে না হলে আজ তোমায় চতুর্দোলায় চড়িয়ে নিয়ে যেতাম বিক্রম। কিন্তু দর্পনারায়ণ চৌধুরী শত্রুকে ক্ষমা করে না।

দর্পনারায়ণের ইঙ্গিতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল শেষ সাতজন লাঠিয়াল।

চকিতে ঘরের দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে বিক্রম শুধু বললে, আর একটু অপেক্ষা করো কঙ্কণা আমি আসছি।

পরক্ষণেই শেষ সাতজনের পহেলা লাঠিয়াল 'হায় বাপ' বলে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে কঙ্কণা। রাঙা বেনারসীর ঘোমটা খসে পড়েছে, সিঁথি-ভরা সিঁদুর জ্বলছে লাল আগুনের আভার মত। সেইখান থেকেই সে বললে, আমি অপেক্ষা করব—সারা জীবন ধরে অপেক্ষা করব—কিন্তু শত্রুপক্ষের এক-জন বেঁচে থাকতে তোমার ফিরে আসা চলবে না।

সহসা চীৎকার করে উঠেই থেমে গেল কঙ্কণা।

এক মুহূর্তের জন্যে উন্মনা হয়ে পড়েছিল বিক্রম। আর তারই সুযোগে শত্রুপক্ষের পহেলা চোট্ পড়ল তার ডান কাঁধে। টাল খেতে খেতে নিজেকে সামলে বিক্রম।

সিঁড়ির নীচ থেকে দর্পনারায়ণের কর্কশ গলা শোনা গেল, পাঁচশো মোহর বক্‌শিস্ দোব, বিক্রম রাওকে যে ঘায়েল করতে পারবে।

শত্রুপক্ষের শেষ দু'জন লাঠিয়াল বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল বিক্রমের ওপর। রাঘবের ভাঙা গলার শেষ চীৎকার শোনা গেল, তারা! আমার ভাঙা কোমরটা একটিবার সিধে করে দে বেটি—একটিবার ছোটকত্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই—

মুখের কথা শেষ হলো না রাঘবের। একঝলক রক্ত তুলে সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে গড়িয়ে পড়ল চত্বরের ওপর।

ডান হাতটা অবশ হয়ে গেছে বিক্রমের। লাঠি চালাচ্ছে শুধু বাঁ-হাতে। চোট করা নয়, শুধু সামাল।

নীচ থেকে দর্পনারায়ণ কর্কশ গলার আবার হেঁকে উঠলেন, হাজার মোহর বক্‌শিস্ দোব, বিক্রম রাওকে যে ঘায়েল করতে পারবে।

ছ'খানা লাঠি একসঙ্গে উঁচু হয়ে উঠল বিক্রমের মাথার ওপরে।

চকিতে পিছু হটে গেল বিক্রম। সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করে এগিয়ে এলো শত্রুপক্ষের ছ'জন।

এক পা এক পা করে বিক্রম এবার পিছু হটছে! সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরছে দর দর্ করে। পিঠ, বুক আর হাতের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে শক্ত হয়ে। তবু তার বাঁ-হাতের একটা লাঠি শত্রুপক্ষের ছ'খানা লাঠিকে একসঙ্গে জবাব দিয়ে চলেছে।

নীচ থেকে সিঁড়ির মাথায় উঠে এলেন দর্পনারায়ণ। হাত দু'খানা তেমনি পিছন দিকে রাখা। কঠিন মুখের রেখায় রেখায় কুটীল নির্দয়তা ঝরে পড়ছে!

ঘরের দরজার কালে দাঁড়িয়েছিল কঙ্কণা। বাপ মেয়েতে দেখা হলো এক মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই মুখ ঘুরিয়ে নিলে কঙ্কণা!

আহত বাঘের মতই গর্জে উঠলেন দর্পনারায়ণঃ আরও হাজার মোহর বক্‌শিস্—যে আমার মেয়েকে ধরে আনতে পারবে।

দরজার গোড়া থেকে কঙ্কণার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমার গায়ের সমস্ত গয়না খুলে দেবো—যে আমার বাবাকে এ বাড়ীর দেউড়ী থেকে বের করে দিতে পারবে।

প্রলয়ের হাওয়া যেন এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। থমকে থেমে রইল ছ'জন লাঠিয়ালের হাতের ছ'খানা লাঠি।

হা হা করে হেসে উঠে দর্পনারায়ণ বললেন, সাবাস্ বেটি! কিন্তু ও গয়না যে আমারই দেওয়া।

সিংহবাহিনীর মূর্তির মত ঘাড় বাঁকিয়ে কঙ্কনা জবাব দিল, পাশানগরের বৌ কখনও শত্রুপক্ষের গয়না গায়ে ছোঁয়ায় না। তোমার দেওয়া গয়না আমি তোমার বাড়ীতেই ফেলে রেখে এসেছি বাবা। এ সমস্ত গয়না আমার শাশুড়ীর।

এক লহমার জন্যে যেন থতিয়ে গেলেন দর্পনারায়ণ।

জ্বলন্ত চোখ দুটো তাঁর হঠাৎ যেন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে উঠল।

কোন্ আঘাতে পাথরের বুকে একটু চিড় খেয়ে গেল কে জানে। মাঝ-দরিয়ায় যে লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে, তারই মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কঙ্কণার মুখের দিকে!

তারপর ভাঙা ভাঙা ধরা ধরা গলায় বলতে লাগলেন, আজ শত্রু হলেও আমি তোর বাপ কঙ্কণা। তুই আমার একমাত্র মা-মরা সন্তান। তোকে হারালে আমার অবস্থা কী হবে, তুই তা কেমন করে বুঝবি বল্? তুই তো জানিস না, লোহার বাসর-ঘরে লখিন্দরকে সাপে কাটার পব চাঁদ সদাগরেব অবস্থা কি হয়েছিল! তুই তো জানিস্ না, রামকে বনবাসে পাঠিয়ে রাজা দশরথ কেন কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন!

কঙ্কণার দুই চোখ জলে ভেসে গেল!

দর্পনারায়ণ তখনও বলছেন, আমি—আমিও তোর বাপ কঙ্কণা! দুনিয়ার সকলের শত্রু হতে পারি, কিন্তু তোর নয়। তোকে শেষবার বলছি, চলে আয়।

অশ্রু-জড়িত শান্তগলায় কঙ্কণা বললে, আমার স্বামীকে যদি জামাইয়ের সম্মান দিয়ে, চতুর্দোলায় বসিয়ে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারো, তবেই আমাকে যেতে বলো বাবা।

চমকে উঠলেন দর্পনাবায়ণ! যেন সাপ দেখেছেন!

জামাইয়ের সম্মান! কাকে? ইন্দ্রজিৎ রাওয়ের ছেলেকে? না, সে আমি পারব না—সে আমি পারব না কঙ্কণা!—দর্পনারায়ণ চৌধুরী মেয়েকে বরং বলি দিতে পারবে, কিন্তু ইজ্জৎ দিতে পারবে না!

লাল চেলীর আঁচল দিয়ে কঙ্কণা দুই চোখের অশ্রু মুছে ফেললে। স্পষ্ট সতেজ গলায় বললে, তবে তুমিও জেনে রাখো বাবা, আমিও তোমারই মেয়ে। বাপের স্নেহের দামেও শ্বশুর-কুলের ইজ্জৎ আমি বেচতে পারব না। তুমি ফিরে যাও।

দেখতে দেখতে মমতাহীন নিষ্ঠুর চাপা রোষে দর্পনারায়ণের রেখাঙ্কিত মুখখানা এমন কুটিল বীভৎস হয়ে উঠল যে, তা বর্ণনার অতীত।

মানুষের মুখ যে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা বন্য জানোয়ারের মুখে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

অস্বাভাবিক শান্তগলায়—অজগরের হিস্‌হিস্‌ শব্দের মত—কঙ্কণাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, বেশ ফিরেই যাচ্ছি। কিন্তু এই ধারণা নিয়েই যাই যাচ্ছি যে, বিয়ের সভা থেকে যে মেয়ে গুপ্ত-প্রণয়ীর সঙ্গে পালিয়ে যায়, সে-মেয়ে অসতী, কুলটা!

চোপরাও!

বিক্রমের গলায় যেন বাজ ডেকে উঠল। চকিতের মধ্যে লাঠির ওপর ভর দেওয়া ঝুঁকে-পড়া অবসন্ন দেহটা তার ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সিধে হয়ে গেল। দুই চোখে বিদ্যুতের আগুন নিয়ে বিক্রম বললে, সম্পর্কে যদি গুরুজন না হতেন, তাহলে আপনার ওই জিভ টেনে ছিঁড়ে নিয়ে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াতাম!

হা হা করে হেসে উঠলেন দর্পনারায়ণ। প্রেতের মত সেই অট্টহাসি বারান্দার খিলানে খিলানে ধাক্কা খেয়ে একটা ভয়াবহ হাহাকার জাগিয়ে তুলল।

তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে তেমনি হিস্‌ হিস্‌ স্বরে বললেন, দর্পনারায়ণ চৌধুরী কখনও অপমানের দেনা বাকী রাখে না। আমার জিভ স্পর্শ করার আগে তোমার জিভ চিরদিনের মত অসাড় করে দিয়ে যাব।

তারপর চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে, তারই মধ্যে দুম্‌ করে একটা আওয়াজ—একঝলক আগুন আর এক-রাশ ধোঁয়া—কঙ্কণার আর্ত চীৎকার আর দর্পনারায়ণের হা হা অট্টহাসি!

পলকে কি যে ঘটে গেল বুঝতে পারিনি। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখি, দর্পনারায়ণের হাতে একটা দো-নলা বন্দুক। আর শ্বেত পাথরের মেঝেয় রাশি রাশি জবা ফুলের মত চাপ চাপ রক্তের ওপর শুয়ে আছে—না, কঙ্কণা নয়—শত্রুপক্ষের ছেলে বিক্রমজিৎ, পাশানগরের এই অদ্ভুত মরণ-বাসরের বর বিক্রমজিৎ।

চীৎকার করে উঠলেন রামনাথ শাস্ত্রী, তোমার মত পিশাচ নরকেও নেই দর্পনারায়ণ ! নিজের হাতে জামাই হত্যা করলে ?

বিকৃত হেসে দর্পনারায়ণ বললেন, ভয় পেয়ো না শাস্ত্রী —আমার বন্দুকে তোমার জন্যেও একটা গুলি ভরা আছে !

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, দর্পনারায়ণ চৌধুরী বরাবর দুই হাত পিছনে রেখে কেন দাঁড়িয়েছিলেন।

বাঁ-হাতে বুকের ক্ষত-মুখটা চেপে ধরে বিক্রম ডাকলে, কঙ্কণা !

পাষাণ প্রতিমা নড়ে উঠল।

কঙ্কণা গিয়ে স্বামীর মাথাটা কোলে তুলে নিল।

একটা সূক্ষ্ম জালে বিক্রমের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। প্রাণপণে চোখ মেলে তবু সে তাকাল কঙ্কণার মুখের দিকে।

মৃত্যু-বাসরে বর-বধূর এ এক অপূর্ব শুভদৃষ্টি। কয়েকটি মুহূর্ত, তবু মনে হল অনন্তকাল।

পৃথিবীর বাতাস ফুরিয়ে আসছে বিক্রমের কাছে। তবু দম নিয়ে বললে, কঙ্কণা, আমাদের বাসর—

স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল কঙ্কণা।

আমাদের বাসর ফুলে ফুলে এমনিই সাজানো থাক—আবার আমরা দু'জনে ফিরে আসব। প্রতি বছর ফাল্গুনের এই তিথিতে আবার আমরা দু'জনে এসে মিলব।

কঙ্কণার বিন্দু বিন্দু চোখের জলে বিক্রমের কপালের শ্বেতচন্দন আর রক্তের ধারা ধুয়ে যাচ্ছে।

বিক্রমের পৃথিবীতে আর বুঝি বাতাস নেই। ক্লান্ত চোখের দুই পাতা ভারী হয়ে আসছে।

স্বামীর মুখের ওপর মুখ রেখে কঙ্কণা তবু বলে চলেছে, শুনছো— শুধু একটিবার শুনে যাও, আমাদের এই বাসর চিরকালই এমনিই সাজানো থাকবে। প্রতি বছর এই রাতে, এই তিথিতে আবার আমরা দু'জনে ফিরে আসব। যাবার আগে আমায় কথা দিয়ে যাও

—বল, আবার ফিরে আসবে—কথা দাও, বলো—

প্রাণপণে চোখের পাতা ছুটো ঈষৎ খুলে, অতি কষ্টে দম নিয়ে বিক্রম শুধু বললে, আবার···আসব···

তারপরই মাথাটা হেলে পড়ল।

হঠাৎ কোথায় থেকে হু হু করে ভেসে এল ঝড়ো হাওয়ার বুকফাটা বিলাপ। চেয়ে দেখি মেঘে মেঘে অন্ধ আকাশে তলিয়ে গেছে অষ্টমীর চাঁদ। ঝড়ো হাওয়ার সেই হাহাকারের সঙ্গে সঙ্গে যেন একশ' শাঁখ আর উলুধ্বনি এই মরণ-বাসর ঘিরে অলৌকিক শব্দে বাজতে লাগল।

সে শব্দে গায়ে কাঁটা দেয়।

দর্পনারায়ণ চীৎকার করে ডাকলেন, চলে আয় কঙ্কণা।

ধীরে ধীরে কঙ্কণা মাথা তুললো। আকাশে তখন বিদ্যুতের খেলা সুরু হয়েছে। সেই আলোতে লাল চেলীপরা কঙ্কণাকে মনে হ'ল যেন রক্তাম্বরা মহাকালী শিবকোলে শ্মশানে বসে আছে!

দর্পনারায়ণ আবার ডাকলেন, চলে আয় কঙ্কণা। ঝড় উঠেছে।

মাথা তুলে কঙ্কণা বললে, একটু দাঁড়াও বাবা। প্রণাম করে আসি।

প্রণাম? কাকে?

আমার শ্বশুর-ঘরকে।

মৃত স্বামী মাথা কোল থেকে নামিয়ে কঙ্কণা ঘরের দিকে এগোল।

দর্পনারায়ণ পিছু ডাকলেন, কোথা যাস্ কঙ্কণা?

কোন জবাব এলো না কঙ্কণা এগিয়ে চলেছে।

দর্পনারায়ণ আবার চীৎকার করে উঠলেন, ওদিকে নয় কঙ্কণা, এগিয়ে আয়—

হু-হু ঝড়ে সে ডাক ভেসে গেল। হাওয়ায় দুলে উঠল হাজার বাতির ঝাড়।

পুষ্পশোভিত পালঙ্কে একবার মাথা ঠেকিয়ে কঙ্কণা আবার চলতে

স্থরু করেছে।

এক পা এগিয়ে দর্পনারায়ণ পাগলের মত ডাকলেন, কঙ্কণা—চলে আয়—

আকাশের বাজ অট্টহেসে উঠল।

কঙ্কণা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাঙা গলায় দর্পনারায়ণ প্রাণপণে ডাকলেন, ফিরে আয় কঙ্কণা—

ঠিক সেই মুহূর্তে লক্‌লকে বিদ্যুতের তলোয়ার সারা আকাশটা চিরে দিয়ে গেল। তারই একঝলক তীব্র আলোয় দেখলাম, দূরে লাল চেলীপরা একটি মূর্তি বারান্দার নীচু রেলিং টপকে অতল অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে।

কিন্তু বারান্দার নীচেই যে খরস্রোতা ভয়ঙ্করী মেঘনা!

মনে হলো, আমার দেহের সমস্ত রক্ত উঠে যাচ্ছে মাথার দিকে দো-নলা বন্দুক হাতে দর্পনারায়ণ তখনও নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে। পায়ের কাছে বিক্রমজিতের রক্তাক্ত মৃতদেহ!

জামার পকেট থেকে রিভলবারটা কখন আমার হাতে চলে এসেছে জানি না। বিদ্যুৎবেগে রিভলবারের মুখ ঘুরে গেল দর্পনারায়ণের দিকে। তারপর একটা আওয়াজ—একরাশ ধোঁয়া—

আবার সেই ধোঁয়ার রহস্যজাল গলে' গলে' মিলিয়ে গেল।

বাইরে তখনও ঝড়। ঘরে মোমের শিখা কাঁপছে।

দেখলাম, প্রেতপুরী পাশানগরের ঘরে রিভলবার হাতে আমি একা দাঁড়িয়ে। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। মাথার ভেতরে সে কী উত্তাপ।

সামনের বড় ফাটা আর্শিখানা টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেয় ছড়িয়ে পড়েছে। সে কি আমারই রিভলবারের গুলিতে?

কিন্তু কই সেই দর্পনারায়ণ চৌধুরী? আর বিক্রমজিতের মৃতদেহ? সেই রাঘব সর্দার আর লাঠিয়াল-পাইকের দল? সেই রামনাথ শাস্ত্রী আর মরণ-বাসরের বধূ কঙ্কণা?

অদূরে বহু পুরানো পালঙ্কে অতি জীর্ণ গালিচার ওপর শুধু

সোমনাথ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আর কেউ নেই।

তবে কি এতক্ষণ যা দেখেছি, সবই কি স্বপ্ন? না আমার কল্পনাপ্রবণ মনের সিনেমা?

সবটাই কি তবে অলৌকিক? কিন্তু অশরীর আত্মা যদি পৃথিবীতে ফিরে না-ই আসে, তাহলে আমার সামনে দেয়ালের গায়ে বাঁকা করে ঝোলানো ওই যে ধূলিমলিন ছবি, ওর ঠোঁট দুটো এখনো অমন স্ফুরিত হয়ে উঠছে কেন? কেন কাঁপছে ওই জলে ভরো-ভরো চোখের পাতার দীর্ঘ পল্লবগুলি?

এই গহন ঝড়ের রাত্রে কোথায় পাব এই রহস্যের কিনারা? আর ভাবতে পারলাম না। ক্লান্তিতে আর রাত্রি জাগরণে শরীরটা ভেঙে পড়তে চাইছিল।

হাত ঘড়িতে দেখলাম, রাত ভোর হতে এখনও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক দেরী। সোমনাথকে জাগিয়ে দিয়ে আমি বিছানা নিলাম।

ঘুম ঠিক নয়, সুগভীর অবসাদে আমার জাগ্রত চেতনা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। সেটা ঘুমও নয়, তন্দ্রাও নয়!

হঠাৎ প্রবল ধাক্কায় আমার চেতনার সাড় ফিরে এল!

সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলার ডাক, শঙ্কর! শঙ্কর! শুনছিস—

বিছানায় উঠে বসলাম। সোমনাথ ডাকছে।

ওই শোন্, কে যেন কাঁদছে।

শব্দটা যেন বাইরের ঝুল-বারান্দা থেকে আসছে। যে বারান্দা ঝুঁকে পড়েছে রাক্ষসী মেঘনার বুকের ওপর।

কান পেতে শুনতে লাগলাম, কে যেন কাঁদছে! কিন্তু এ তো কান্না নয়, এ যে পরম আশার কথা—চরম সুখের কথা!

সজল আবেগে কে যেন বলছে: আমাদের এই বাসর চিরকাল এমনিই সাজানো থাকবে—এমনি ফুলে ফুলে সাজানো, এমনিই ধূপ-দীপ জ্বালানো। প্রতি বছর এই রাতে, এই তিথিতে আবার দু'জনে ফিরে আসব।

আমার একখানা হাত চেপে ধরে সোমনাথ চাপা গলায় বললে, একথা কে বলছে শঙ্কর ? কাকে বলছে ?

চিনেছি। বেহাগের মত মৃদু মিঠে অথচ সজল এই কণ্ঠস্বর—এ কঙ্কণার।

কিন্তু কোথায় কঙ্কণা ? আশে পাশে ঘরের বারান্দায় তার চিহ্নও তো কোথাও নেই ! কঙ্কণার অশরীরী আত্মা তখনও বলে চলেছে, সেই রাত আবার ফিরে এসেছে—তেমনিই সাজানো রয়েছে আমাদের ফুলের বাসর। কোথায় তুমি ? শূন্য বাসরে আমি জেগে আছি। এসো—ফিরে এসো—আর যে অপেক্ষা করতে পারি না। এসো, এসো, ফিরে এসো।

আওয়াজটা এবার আরও কাছে ! আমাদের আশে পাশে।

অনন্তকালের তৃষ্ণা নিয়ে কঙ্কণা ডাকছে বিক্রমজিতকে।

কতকাল ধরে ডাকছে কে জানে। আরও কতকাল ধরে ডাকতে হবে, তাই বা কে জানে।

কিন্তু আজকের এই এলোমেলো ঝড়ো হাওয়ায় ঘরের ভিতর কোথা থেকে ভেসে এল এত ফুলের সৌরভ ? ধূপ-দীপের এই সুগন্ধ ?

মালা গেঁথে প্রদীপ জ্বালিয়ে কোন্ বিরহিনী বুঝি প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় অনন্ত রাত্রি যাপন করছে। সে কি শুধু পাশানগরের বধূ কঙ্কণা ? না, প্রত্যেক মানুষের মনের অবচেতনায় অতৃপ্ত প্রেমের যে অনন্ত তৃষ্ণা লুকিয়ে থাকে, তারই কাল্পনিক রূপ ?

সহসা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ও আবার কে কাঁদে ?

ভাঙা ভাঙা মোটা কর্কশ গলার বীভৎস আক্ষেপ। মনে হলো, শব্দটা যেন ঘরের ওপাশের বারান্দা পার হয়ে নীচের উঠোন থেকে আসছে।

ছুটে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম সিঁড়ির মুখে।

আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, নীচের সেই আগাছা-ঘেরা ভগ্নস্তূপের মাঝখানে লোলচর্ম পলিতকেশ খর্বকায় এক

ছায়ামূর্তি হাত দুটো পিছন দিকে রেখে প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ভাঙা ভাঙা মোটা কর্কশ গলায় চীৎকার করে উঠছে : ফিরে চল্ ! আমি তোর বাবা, তুই না গেলে আমারও যে ফিরে যাও হ'বে না। মিনতি করছি কঙ্কণা, ফিরে চল্ ।

ভগ্নস্তূপের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেই ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়া নীচের সিঁড়ির গোড়ায়। তারপর ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে ভাঙা মোটা গলায় সেই বুকফাটা কান্না প্রেতপুরী পাশানগরের রন্ধ্রে ধাক্কা খেয়ে, আমাদের চারপাশে যেন একশোটা ঝাঁঝর-করতালের মত বাজতে লাগল।

দুই হাতে কান চেপে ধরে আমি প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলাম, চুপ করো দর্পনারায়ণ চৌধুরী, চুপ করো !

সোমনাথ আমার একখানা হাত সজোরে চেপে ধরে আছে তার হাত কাঁপছে। সঘন নিঃশ্বাসে কাঁপা গলায় সে বললে, কি হলো তোর শঙ্কর ? কাকে কি বলছিস ? এ এ সব কী ?

জবাব দেবার অবস্থা ছিল না।

আমার হাতখানা ধরে সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে পাগলের সোমনাথ বললে, সত্যি করে বল শঙ্কর, এ আমরা কোথায় এসেছি

শুধু বললাম, অভিশপ্ত পাশানগরে।

স্তব্ধ হ'য়ে দু'জনে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, জানি না।

কান্না তখন থেমে গেছে। মিলিয়ে গেছে দর্পনারায়ণের প্রেত-ছায়া। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, পূর্ব দিগন্ত ফ হয়ে আসছে। ঝড় এসেছে শান্ত হয়ে।

সোমনাথের হাতখানা ধরে বললাম, চলো চল্—

—শেষ